ও সাহায্য-প্রাপ্ত জামাআতের মতাদর্শ

প্রণয়নেঃ-
মুহাম্মদ জামীল যইনু
অধ্যাপক দারুল হাদীস আল খাইরিয়্যাহ,মক্কা আল-মুকার্রামাহ

ভাষান্তরেঃ-
আব্দুল হামীদ আল-ফায়যী

প্রকাশনায়ঃ
সমবায় দা’ওয়াত কার্যালয়
পোঃ বঃ- ১০২
আল-মাজমাআহ ১১৯৫২
টেলিফোন ০৬ ৪৩২৩৯৪৯, ফ্যাক্সঃ ০৬ ৪৩১১৯৯৬

অনুবাদকের কথা

• ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ ٱتَّقُواْ رَبَّكُمُ ٱلَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَّفۡسٖ وَٰحِدَةٖ وَخَلَقَ مِنۡهَا زَوۡجَهَا وَبَثَّ مِنۡهُمَا رِجَالٗا كَثِيرٗا وَنِسَآءٗۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ٱلَّذِى تَسَآءَلُونَ بِهِۦ وَٱلۡأَرۡحَامَۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلَيۡكُمۡ رَقِيبٗا ﴾ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِۦ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُّسۡلِمُونَ ﴾ ﴿ يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَقُولُواْ قَوۡلٗا سَدِيدٗا ٧٠ يُصۡلِحۡ لَكُمۡ أَعۡمَٰلَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ذُنُوبَكُمۡۗ وَمَن يُطِعِ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ فَقَدۡ فَازَ فَوۡزًا عَظِيمًا ٧١ ﴾

শ্রদ্ধেয় মুহাম্মাদ বিন জামীল যাইনু (হাফেযাহুল্লা-হু তাআলা) সাহেব সিরিয়া দেশের এক প্রতিভাধর কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর অনুসারী সালাফী আলেম। বর্তমানে তিনি মক্কা মুকার্রামার বাসিন্দা এবং দারুল হাদীস আল-খাইরিয়্যাহ’র অন্যতম শিক্ষক। শিক্ষকতার সাথে সাথে তিনি দা’ওয়াত ও তবলীগের কাজে নিজেকে ওয়াক্ফ ও উৎসর্গ করে দিয়েছেন। ‘হক’ ও সত্যের সন্ধান পেয়ে মানুষকে তার সন্ধান দিতে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে বহু বই-পুস্তক রচনা করেছেন। অত্র পুস্তকখানি সেই সিরিজের অন্যতম।

শির্কের প্রচলন ও ধরন প্রায় সকল দেশে একই প্রকার। তিনি তাঁর নিজ দেশ ও পরিবেশে ঘটমান যে সব শির্ক ও বিদ্‌আতকে চিহ্নিত করেছেন তা আমাদের দেশ ও পরিবেশেও দৃশ্যমান। তাই বইটির অনুবাদ ফলপ্রসূ ও যথার্থ হবে বলেই আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস। বাংলার মানুষ যদি এ ধরনের নির্দেশিকার অনুসরণ করেন তবে নিঃসন্দেহে তাঁরা সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হবেন, যে দল পার্থিব জীবনে বাতিলের বিরুদ্ধে জিহাদে আল্লাহর তরফ হতে সাহায্যপ্রাপ্ত, যে দলের একমাত্র নেতা ও প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মাদ রসূলুল্লাহ ﷺ এবং তাঁর সাহাবায়ে কেরাম ﷺ। যে দলের দলীয় নীতি আল-কুরআন, সহীহ সুন্নাহ ও সালাফের ব্যাখ্যা। যে দল কিয়ামত আসা পর্যন্ত বাতিলের উপর হক নিয়ে বিজয়ী থাকবে ও তার বিরুদ্ধবাদীরা তার কোনও ক্ষতিসাধন করতে পারবে না। আর যে দল পরকালে আল্লাহর আযাব ও জাহান্নাম হতে মুক্তি প্রাপ্ত হবে।

যে দলের মতাদর্শ অতি নির্মল। যাতে কোন পার্থিব স্বার্থান্বেষিতা নেই। নেই কোন 'মারপ্যাঁচ' ও প্রবঞ্চনা। কুরআন ও সুন্নাহর কোন অপব্যাখ্যা নেই। সহীহ সুন্নাহর কোন প্রকার রদ্দ্ বলতে নেই। সুন্নাহর নামে দুর্বল, জাল ও ভিত্তিহীন হাদীস এবং কোন অদ্ভুত গালগপ্পের শরয়ী স্থান নেই। এ দলের নেতা ও নীতি ব্যতীত আর কারো ব্যক্তিত্ব ও মতপূজা এবং অন্ধ-পক্ষপাতিত্ব নেই। এই দলই তো **'ফির্কাহ না-জিয়াহ ও তায়েফাহ মানসূরাহ।'**

আল্লাহর নিকট সকাতর প্রার্থনা যে, তিনি সকল মুসলিমকে এই দলেরই দলভুক্ত করুন এবং পৃথিবীর বুকে তাঁর সংবিধান প্রতিষ্ঠা করে, ইসলামের বিজয়-নিশান উড্ডয়মান করে এবং মানুষকে শান্তির সুধা পান করিয়ে 'খেলাফত'-এর দায়িত্ব পালনে প্রয়াস ও প্রেরণা দিন। আল্লাহুম্মা আমীন।

আব্দুল হামীদ ফায়যী
আল মাজমাআহ্
১৬/৫/৯৫ খ্রিঃ

:

অত্র পুস্তিকাটি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও বিভিন্নমুখী গবেষণা-প্রবন্ধের সমষ্টি, যা সকল মুসলিমকে নির্ভেজাল তওহীদের আকীদার (একত্ববাদের বিশ্বাসের) প্রতি আহ্বান করে এবং অধিকাংশ ইসলামী রাষ্ট্রসমূহে প্রচলিত শির্ক হতে সুদূরে থাকতে আবেদন করে। যে শির্ক পূর্ববর্তী জাতিসমূহের ধ্বংসের এবং বর্তমান পৃথিবীর দুর্গতি ও দুর্দশার মূল কারণ। বিশেষ করে মুসলিম জাহান যার কারণে শতমুখী বিপদ, দুরবস্থা, যুদ্ধ ও বিশৃঙ্খলার সম্মুখীন।

এই গবেষণামূলক প্রবন্ধ ও বিষয়াবলী **'ফির্কাহ নাজিয়াহ অ তায়েফাহ মনসূরাহ'** (মুক্তি প্রাপক দল এবং সাহায্যপ্রাপ্ত জামাআত)এর আকীদাহ ও বিশ্বাস স্পষ্টাকারে বিবৃত করবে -যেমন হাদীসে নববীতে বর্ণিত হয়েছে। যাতে জগদ্বাসীর জন্য সত্য পথ আলোকিত ও স্পষ্ট হয়ে উঠে এবং তারা মোক্ষ ও সাহায্যপ্রাপ্ত হতে পারে। ইনশা-আল্লাহ।

আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করি, যেন তিনি এই পুস্তিকা দ্বারা সমগ্র মুসলিম জাতিকে উপকৃত করুন এবং তা একমাত্র তাঁর সন্তুষ্টির জন্য বিশুদ্ধ করুন।

-মুহাম্মদ বিন জামীল যইনু

মুক্তি প্রাপ্ত দল

১। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ ঃ- তোমরা আল্লাহর রশিকে (ধর্ম বা কুরআন)কে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ কর এবং পরস্পর বিছিন্ন হয়ে পড়ো না। *(সূরা আলে ইমরান ১০৩ আয়াত)*

২। তিনি আরো বলেন,

( )

অর্থাৎ, আর অংশীবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না; যারা দ্বীন সম্বন্ধে নানামতের সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। *(সূরা রূম ৩২ আয়াত)*

৩। রসূল ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ-ভীতি এবং (নেতার নেতৃত্ব) মান্য ও আনুগত্য করতে অসিয়ত করছি; যদিও তোমাদের নেতা একজন হাবশী ক্রীতদাস হয়। যেহেতু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (আমার মৃত্যুর পরও জীবিত থাকবে সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত (আদর্শ) এবং সুপথ প্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত (আদর্শ) অবলম্বন করো, তা শক্ত করে ধারণ করো এবং দন্ত দ্বারা দৃঢ়ভাবে ধরো। আর অভিনব কর্মাবলী হতে দূরে থেকো। যেহেতু প্রত্যেক অভিনব কর্ম বিদ্‌আত, প্রত্যেক বিদ্‌আত ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যায়)।" *(হাদীসটিকে নাসাঈ এবং তিরমিযী বর্ণনা করেছেন, তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)*

৪। তিনি আরো বলেন, "সাবধান! তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব (ইয়াহুদী ৭১ ও খ্রিষ্টান)রা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে, আর এই মিল্লাত (উম্মত) ৭৩ দলে বিভক্ত হবে ; ৭২ টি দল জাহান্নামে যাবে এবং একটি যাবে জান্নাতে আর সেটি হল জামাআত।" *(হাদীসটিকে আহমদ প্রমুখ বর্ণনা করেছেন এবং হাফেয হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)*

দ্বিতীয় এক বর্ণনায় তিনি বলেন, "কেবল একটি দল ব্যতীত সবগুলি জাহান্নামে যাবে; যে দলটি আমি ও আমার সাহাবার মতানুসারী হবে।" *(হাদীসটিকে তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং আলবানী সহীহুল জামে' (৫২১৯)তে এটিকে হাসান বলেছেন।)*

৫। ইবনে মাসউদ ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ﷺ আমাদের জন্য স্বহস্তে একটি রেখা টানলেন। অতঃপর তিনি বললেন, "এটি আল্লাহর সরল পথ।" অতঃপর ঐ রেখার ডাইনে ও বামে কতকগুলি রেখা টেনে বললেন, "এগুলি বিভিন্ন পথ। এই পথগুলির প্রত্যেটির উপর একটি করে শয়তান আছে; যে ঐ পথের প্রতি মানুষকে আহ্বান করে।" অতঃপর তিনি আল্লাহ তাআলার এই বাণী পাঠ করলেন,

)

(

অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ কর এবং বিভিন্ন পথের অনুসরণ করো না। করলে তা তোমাদেরকে তাঁর পথ হতে বিচ্ছিন্ন করবে। এ ভাবে আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা সাবধান হও। *(সূরা আনআম ১৫৩ আয়াত) (হাদীসটি সহীহ, এটিকে আহমদ ও নাসাঈ বর্ণনা করেছেন।)*

৬। শায়খ (পীর) আব্দুল কাদের জীলানী তাঁর গ্রন্থ 'গুন্য়্যাহ'তে বলেন, 'আহলে সুন্নাহ অল জামাআতই ফির্কাহ নাজিয়াহ (মুক্তিপ্রাপ্ত দল)। আর আহলে সুন্নাহর একটি নাম ছাড়া অন্য কোন নাম নেই। আর তা হল আসহাবুল হাদীস।'

৭। আল্লাহ সুবহানাহু তাআলা আমাদেরকে আদেশ করেন যে, আমরা যেন কুরআন করীমকে শক্তভাবে ধারণ করি এবং সেই মুশরেকিন (পৌত্তলিক)দের দলভুক্ত না হই যারা স্বধর্মে বিভিন্ন দল ও জামাআত সৃষ্টি করে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। রসূল করীম ﷺ আমাদেরকে জানান যে, ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানরা বহু দলে বিভক্ত হয়েছে আর মুসলিমরা তাদের চেয়ে আরো অধিক দলে বিভক্ত হবে। সত্য পথ হতে বিচ্যুত হওয়ার কারণে এবং আল্লাহর কিতাব ও নবীর সুন্নাহ হতে দূরে থাকার ফলে এই সকল ফির্কাহগুলি জাহান্নামের শিকার হবে। এদের মধ্যে একটি ফির্কাহই জাহান্নাম হতে মুক্তি লাভ করে জান্নাত প্রবেশ করবে ;

আর এই ফির্কাহ হল সেই জামাআত, যে কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ এবং রসূল ﷺ-এর চরিত্রকে (নিজেদের আদর্শরূপে) শক্তভাবে ধারণ করবে।

হে আল্লাহ! আমাদেরকে ফির্কাহ নাজিয়াহর দলভুক্ত কর এবং সমগ্র মুসলমানকে ঐ দলভুক্ত হওয়ার তওফীক দান কর।

ফির্কাহ নাজিয়াহ্র মতাদর্শ

১। ফির্কাহ নাজিয়াহ (মুক্তি প্রাপ্ত দল), যে ফির্কাহ রসূল ﷺ-এর জীবনাদর্শ ও তাঁর পর তাঁর সাহাবাগণের মতাদর্শের অনুসারী। আর সে আদর্শ হল কুরআন করীম; যা আল্লাহ তাঁর রসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন এবং রসূল তাঁর সাহাবাগণের নিকট তা সহীহ হাদীসে ব্যাখ্যা করেছেন এবং (ঐ কিতাব ও তার ব্যাখ্যা বা সুন্নাহ) উভয়কে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করতে আদেশ করেছেন। তিনি বলেছেন, "আমি তোমাদের মাঝে দুটি জিনিস রেখে যাচ্ছি, যা অবলম্বন করলে তোমরা কখনই পথভ্রষ্ট হবে না। তা হল আল্লাহর কিতাব এবং আমার সুন্নাহ। 'হওয' (কাওসারে) আমার নিকট অবতরণ না করা পর্যন্ত তা বিচ্ছিন্ন হবে না।" *(হাদীসটিকে আলবানী সহীহুল জামে'তে সহীহ বলেছেন।)*

২। ফির্কাহনাজিয়াহ বিতর্ক ও মতানৈক্যের সময় আল্লাহর বাণীর অনুসারী হয়ে তাঁর এবং তাঁর রসূলের উক্তির প্রতি রুজু করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মতভেদ ঘটে তবে সে বিষয় তোমরা আল্লাহ ও রসূলের প্রতি ফিরিয়ে দাও। এটিই তো উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। *(সূরা নিসা ৫৯ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

)

(

অর্থাৎ, কিন্তু না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! তারা মুমিন হতে পারবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে তাদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে না নেয়। *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

৩। ফির্কাহ নাজিয়াহ আল্লাহর বাণীর অনুসারী হয়ে আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের উক্তির উপর কারো উক্তিকে অগ্রাধিকার ও প্রাধান্য দেয় না।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! আল্লাহ ও তার রসূলের সম্মুখে তোমরা কোন বিষয়ে অগ্রণী হয়ো না এবং আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ অবশ্যই সর্বশ্রোতা সর্বজ্ঞ। *(সূরা হুজুরাত ১ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আমার মনে হয় ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে। আমি বলছি, 'নবী ﷺ বলেছেন' আর ওরা বলছে, 'আবু বকর ও উমর বলেছেন।' *(এটিকে আহমদ প্রভৃতিগণ বর্ণনা করেছেন ও আহমাদ শাকের এটিকে সহীহ বলেছেন)*

৪। ফির্কাহ নাজিয়াহর বিবেচনায় তওহীদ হল, সকল প্রকার ইবাদত; যেমন, দুআ বা প্রার্থনা, সাহায্য ভিক্ষা, বিপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে আহ্বান, যবেহ, নযর-নিয়ায, ভরসা, আল্লাহর বিধান অনুসারে বিচার ও শাসন করা ইত্যাদিতে আল্লাহকে একক মানা। এটাই হল সেই বুনিয়াদ যার উপর সঠিক ইসলামী রাষ্ট্র রচিত হয়। সুতরাং অধিকাংশ মুসলিম দেশগুলিতে বর্তমানে যে শির্ক এবং তার বহিঃপ্রকাশ রয়েছে তা দূরীভূত করা একান্ত জরুরী। যেহেতু তা তওহীদের এক দাবী। সে জামাআতের বিজয় অসম্ভব যে জামাআত তওহীদকে অবহেলার সাথে উপেক্ষা করে এবং সকল রসূল ও বিশেষ করে আমাদের সম্মানিত রসূল-সালাওয়াতুল্লাহি অসালামুহু আলাইহিম আজমাঈন -কে আদর্শ মেনে সর্বপ্রকার শির্কের বিরুদ্ধে অবিশ্রাম সংগ্রাম না করে।

৫। ফির্কাহ নাজিয়াহ্ তার ইবাদতে, ব্যবহারে ও আচরণে বরং সারা জীবনে রসূল ﷺ-এর সুন্নাহকে জীবিত করে। যার কারণে এত লোকের মাঝে তারা (প্রবাসীর মত) মুষ্টিমেয় ও বিরল। যেমন রসূল ﷺ তাদের প্রসঙ্গে অবহিত

করে বলেছেন, "নিশ্চয় ইসলাম (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্পসংখ্যক মানুষ নিয়ে শুরুতে আগমন করেছে এবং অনুরূপ অল্প সংখ্যক মানুষ নিয়েই ভবিষ্যতে প্রত্যাগমন করবে যেমন শুরুতে আগমন করেছিল। সুতরাং সুসংবাদ ঐ মুষ্টিমেয় লোকেদের জন্য।" *(হাদীসটিকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে,"--- সুতরাং শুভ সংবাদ ঐ (প্রবাসীর মত অসহায়) অল্প সংখ্যক লোকদের জন্য যারা মানুষ অসৎ হয়ে গেলে তাদেরকে সংস্কার করে সঠিক পথে রাখতে সচেষ্ট হয়। *(আলবানী বলেন এটিকে আবু আম্র আদ্দা-নী সহীহ সনদ দ্বারা বর্ণিত করেছেন।)*

৬। ফির্কাহ নাজিয়াহ আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের উক্তি ছাড়া আর কারো উক্তি ও কথার পক্ষপাতিত্ব করে না। যে রসূল ছিলেন নিষ্কলুষ এবং যিনি নিজের খেয়াল-খুশী মতে কোন কথা বলতেন না। কিন্তু তিনি ব্যতীত অন্য মানুষ, যতই তিনি বহুমুখী মর্যাদার অধিকারী হন না কেন, ভুল করতেই পারেন। নবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক আদম সন্তান ত্রুটিশীল ও অপরাধী, আর অপরাধীদের মধ্যে উত্তম লোক তারা যারা তওবা করে।" *(হাদীসটি হাসান এটিকে আহমদ বর্ণনা করেছেন।)*

ইমাম মালেক বলেন, 'নবী ﷺ-এর পর তিনি ব্যতীত প্রত্যেকেরই কথা গ্রহণ করা বা উপেক্ষাও করা যাবে। (অর্থাৎ তিনি ব্যতীত অন্য সকলের অভিমত ও উক্তি গ্রহণীয় এবং উপেক্ষণীয়ও।)

৭। ফির্কাহ নাজিয়াহ হল 'আহলে হাদীস'। যাদের সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আমার উম্মতের মধ্যে এক দল চিরকাল হক (সত্যের) উপর বিজয়ী থাকবে আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্বমুহূর্ত) আসা পর্যন্ত, যারা তাদেরকে পরিত্যাগ করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(এটিকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন।)*

কবি বলেন,

" আহলে হাদীসরা আহলে নবী, যদিও
তারা তাঁর ব্যক্তিত্বের সাহচর্যে ছিল না
কিন্তু তারা তাঁর বাণীর সংসর্গে থাকে।"

৮। ফির্কাহ নাজিয়াহ আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীন (মুজতাহিদ সকল ইমাম)কে শ্রদ্ধা করে। তাঁদের মধ্যে কোন একজনের একতরফা পক্ষপাতিত্ব করে না। বরং ফিক্‌হ (দ্বীনের জ্ঞান) গ্রহণ করে কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহ হতে এবং তাঁদের উক্তি সমূহ হতেও -যদি তা সহীহ হাদীসের অনুসারী হয়। আর এই নীতিই তাঁদের নির্দেশের অনুকূল। যেহেতু তাঁরা সকলেই নিজ নিজ অনুসারীগণকে সহীহ হাদীসের মত গ্রহণ করতে এবং এর প্রতিকূল প্রত্যেক মত ও উক্তিকে প্রত্যাখ্যান করতে অসিয়ত করে গেছেন।

৯। ফির্কাহ নাজিয়াহ সৎকাজের আদেশ দেয় এবং অসৎ কাজে বাধা প্রদান করে। এই দল বিদ্‌আতী সকল নীতি এবং সর্বনাশী দলসমূহকে প্রতিহত করে -যে দলসমূহ উম্মতকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে ও দ্বীনে বিদআত রচনা করে রসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবার সুন্নাহ (ও নীতি) থেকে দূরে সরে আছে।

১০। ফির্কাহ নাজিয়াহ সমগ্র মুসলিম জাতিকে রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণের সুন্নাহ (তরীকা)কে দৃঢ়ভাবে ধারণ করতে আহবান করে। যাতে তাদের বিজয় সুনিশ্চিত হয় এবং আল্লাহর অনুগ্রহে ও তাঁর রসূল ﷺ-এর সুপারিশে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারে।

১১। ফির্কাহ নাজিয়াহ মনগড়া সমস্ত মানব রচিত আইন-কানুনকে অস্বীকার করে। কারণ তা ইসলামী আইনের বিরোধী ও পরিপন্থী। আর আল্লাহর কিতাবকে জীবন ও রাষ্ট্র-সংবিধান রূপে মেনে নিতে সকলকে আহববান করে -যে কিতাবকে আল্লাহ মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-সমৃদ্ধির জন্য অবতীর্ণ করেছেন। আর তিনিই অধিক জানেন, কি তাদের জন্য কল্যাণকর। সেই কুরআন অপরিবর্তনীয়। যার বিধান কোন কালেও পরিবর্তিত হবে না এবং যুগের বিবর্তনে তার ক্রম-বিকাশও ঘটবে না। নিশ্চিত ভাবে সারা বিশ্বের এবং বিশেষ করে মুসলিম-বিশ্বের দুর্গতি, বিভিন্ন কষ্ট, লাঞ্ছনা এবং অবজ্ঞার সম্মুখীন হওয়ার একমাত্র কারণ হল আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রসূলের সুন্নাহ দ্বারা জীবন ও রাষ্ট্র পরিচালনা ত্যাগ করা। ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রগতভাবে ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশের প্রতি প্রত্যাবর্তন ছাড়া মুসলিমদের কোন ইজ্জত ও শক্তি ফিরে আসতে পারে না। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেন না -যে পর্যন্ত না তারা নিজের অবস্থা নিজে পরিবর্তন করে। *(সূরা রা'দ ১১ আয়াত)*

১২। ফির্কাহ নাজিয়াহ সকল মুসলিমকে আল্লাহর পথে জিহাদের দিকে আহ্বান করে। আর জিহাদ প্রত্যেক মুসলিমের উপর তার শক্তি ও সামর্থ্যানুযায়ী ওয়াজেব। এই জিহাদ বিভিন্ন মাধ্যমে হয়ে থাকে ঃ-

(ক) রসনা ও কলম দ্বারা জিহাদ ; মুসলিম ও অমুসলিমকে সঠিক ও বিশুদ্ধ ইসলাম এবং সেই শির্কমুক্ত তওহীদ বরণ এবং শক্তভাবে ধারণ করার প্রতি আহবান করা, যে শির্ক বহু মুসলিম দেশেই প্রসার লাভ করেছে। যে বিষয়ে রসূল ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করেছেন যে, তা মুসলিমদের মাঝে আপতিত হবে। তিনি বলেছেন, "কিয়ামত আসবে না যে পর্যন্ত না আমার উম্মতের কিছু সম্প্রদায় মুশরিকদের সাথে মিলিত হবে এবং আমার উম্মতের কিছু সম্প্রদায় মূর্তিপূজা করবে।" *(হাদীসটি সহীহ, এটিকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন এবং এর মর্মার্থ নিয়ে একটি হাদীস মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে।)*

(খ) অর্থ দ্বারা জিহাদ ; ইসলাম প্রচার করা ও ইসলামের প্রতি সঠিকভাবে আহবানকারী বই-পুস্তক ছাপানোর উপর অর্থ ব্যয় করে, নও মুসলিম এবং দুর্বলশ্রেণীর মুসলিম -যাদের মনকে ইসলামের প্রতি অনুরাগী করা প্রয়োজন - তাদের মাঝে বন্টন করে এবং মুজাহেদীনদের জন্য অস্ত্র-শস্ত্র, যুদ্ধ-সামগ্রী ও প্রয়োজনীয় খাদ্য-বস্ত্র ইত্যাদি নির্মাণ ও ক্রয় করার উপর খরচ করে এই জিহাদ হয়।

(গ) প্রাণ দ্বারা জিহাদ ; ইসলামের বিজয়ের জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করে লড়াই লড়ে এই জিহাদ হয়, যাতে আল্লাহর বাণীই সমুন্নত আর কাফেরদের বাণী ভূলুণ্ঠিত হয়।

জিহাদের এই প্রকারগুলির প্রতি ইঙ্গিত করে রসূলে করীম ﷺ বলেছেন, "তোমরা তোমাদের অর্থ, প্রাণ এবং জিহ্বা দ্বারা মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ কর।" *(হাদীসটি সহীহ, এটিকে আবু দাউদ বর্ণনা করেছেন।)*

আল্লাহর পথে জিহাদের শরয়ী মান ও নির্দেশ কয়েক প্রকার ;

১। ফরযে আইন (যা ব্যক্তিগত ভাবে প্রত্যেকের উপর ফরয)। এই মান তখন হয় যখন কোন মুসলিম দেশকে শত্রুপক্ষ আক্রমণ ও গ্রাস করে। যেমন

ফিলিস্তীন (প্যালেষ্টাইন); যাকে দুষ্কৃতী ইয়াহুদীরা জবরদখল করে নিজেদের করায়ত্ত করে ফেলেছে। সুতরাং যথাসাধ্য জান ও মাল ব্যয় করে ঐ দেশ হতে ইয়াহুদীকে বহিষ্কার না করা পর্যন্ত এবং মসজিদে আক্সাকে মুসলিমদের প্রতি ফিরিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত সকল সামর্থ্যবান মুসলমান গোনাহগার থাকবে।

২। ফরযে কিফায়াহ; যথেষ্ট পরিমাণে কিছু লোক ঐ কর্তব্য পালন করলে অবশিষ্ট মুসলিমদের উপর তা আর ফরয থাকে না। সারা বিশ্বে ইসলামী দাওয়াত পৌঁছে দেওয়ার পথে এই জিহাদ সম্পন্ন হয়, যাতে সকল রাষ্ট্র ইসলামকেই রাষ্ট্রীয় সংবিধান বলে মেনে নেয়। আর যে ব্যক্তি এই দাওয়াতকে প্রতিহত করার পথে খাড়া হবে তাকেও পরাভূত করার উদ্দেশ্যে তার বিরুদ্ধে জিহাদ করা হবে -যাতে দাওয়াত তার প্রবাহ পথে গতিশীল থাকে।

ফির্কাহ নাজিয়াহ্‌র নিদর্শন

১। ফির্কাহ নাজিয়াহ মানুষের মধ্যে (প্রবাসীর মত অসহায়) মুষ্টিমেয়। যাদের জন্য আল্লাহর রসূল ﷺ দুআ করে বলেছেন, "শুভ সংবাদ ঐ (প্রবাসীর মত অসহায়) মুষ্টিমেয় লোকেদের জন্য; যারা বহু অসৎ লোকের মাঝে অল্পসংখ্যক সৎলোক। তাদের অনুগত লোকের চেয়ে অবাধ্য লোকের সংখ্যা অধিক।" *(সহীহ, এটিকে আহমদ বর্ণনা করেছেন।)*

এই দলের অনুসারীদের সম্পর্কে কুরআন কারীম সংবাদ দিয়েছে, এদের প্রশংসা করে কুরআন বলে,

(   )

অর্থাৎ, আমার বান্দাগণের মধ্যে অল্পসংখ্যকই লোক কৃতজ্ঞ। *(সূরা সাবা ১৩ আয়াত)*

২। ফির্কাহ নাজিয়াহর শত্রু বহু মানুষ। লোকেরা তাদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ দেয়। তাদেরকে মন্দনাম ও খেতাবে অভিহিত করে থাকে। অবশ্য এ বিষয়ে তাদের আদর্শ ও নমুনা ছিলেন আম্বিয়াগণ; যাঁদের প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

)

(

অর্থাৎ, এবং এরূপে প্রত্যেক নবীর জন্য শয়তান মানব ও দানবকে শত্রু করেছি যারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে ---। *(সূরা আনআম ১১২ আয়াত)*

আল্লাহর রসূল ﷺ যখন তাঁর সম্প্রদায়ের নিকট তওহীদের দাওয়াত পেশ করলেন তখন তারা তাঁকে বলেছিল, 'মিথ্যুক যাদুকর।' অথচ এর পূর্বে তারা তাঁকে 'সত্যবাদী আমানতদার' বলে আখ্যাত করত।

৩। শায়খ আব্দুল আযীয বিন বায (সউদী আরবের প্রধান মুফতী) ফির্কাহ নাজিয়াহ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেন, 'সালাফীগণই ফির্কাহ নাজিয়াহ; এবং তারা যারা সলফে সালেহ (রসূল ও সাহাবা)র মতাদর্শে চলে।'

এগুলি ফির্কাহ নাজিয়াহর অল্প কিছু নীতি ও নিদর্শন। এবারে এই পুস্তিকার আগামী অধ্যায়গুলিতে ফির্কাহ নাজিয়াহর আকীদা ও বিশ্বাস সম্পর্কে আলোচনা করব; যে ফির্কাহর আর এক নাম 'তায়েফাহ মনসূরাহ' (সাহায্য প্রাপ্ত দল)। যাতে আমরা সকলে তার আকীদায় বিশ্বাসী হতে পারি। ইন শাআল্লাহ।

সাহায্যপ্রাপ্ত দল কোনটি ?

১। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "সর্বকালে আমার উম্মতের একটি দল হকের সাথে বিজয়ী থাকবে, তাদেরকে যারা উপেক্ষা করবে তারা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না; যতক্ষণ না আল্লাহর আদেশ (কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্ত) এসে উপস্থিত হবে।"(মুসলিম)

২। তিনি আরো বলেন, "শামবাসী অসৎ হয়ে গেলে তোমাদের মধ্যে কোন মঙ্গল নেই। আর চিরকালের জন্য আমার উম্মতের একটি দল সাহায্য প্রাপ্ত থাকবে, কিয়ামত কায়েম হওয়া পর্যন্ত তাদেরকে উপেক্ষাকারীরা তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

৩। ইবনুল মুবারক বলেন, 'আমার মতে তাঁরা হলেন আসহাবুল হাদীস।'

৪। ইমাম বুখারী বলেন, আলী ইবনুল মাদানী বলেছেন, 'তাঁরা হলেন আসহাবুল হাদীস।'

৫। আহমাদ বিন হাম্বল বলেন, 'এই সাহায্যপ্রাপ্ত দলটি যদি আসহাবুল হাদীস না হয় তবে জানি না তারা কারা ?'

৬। আহলে হাদীসরাই যেহেতু সুন্নাহ এবং তার আনুষঙ্গিক সকল বিষয়ের অধ্যয়নে বিশেষজ্ঞ তাই তারাই সকল মানুষের চেয়ে তাদের নবী ﷺ-এর সুন্নাহ, আদর্শ, পথনির্দেশ, চরিত্র, যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং এর সম্পৃক্ত যাবতীয় বিষয়ে অধিক জ্ঞান রাখে।

৭। ইমাম শাফেয়ী ইমাম আহমাদকে সম্বোধন করে বলেন, 'আপনারা আমার চেয়ে অধিক হাদীস জানেন। অতএব আপনাদের নিকট শুদ্ধভাবে কোন হাদীস এলে সে বিষয়ে আমাকে খবর দেবেন, আমি তা সংগ্রহের জন্য যাত্রা করব -চাহে তা হিজায, কূফা অথবা বসরায় হোক।'

সুতরাং আহলে হাদীস -আল্লাহ আমাদের হাশর তাদের সহিত করেন - কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তি বিশেষের পক্ষপাতিত্ব করে না -তাতে সে ব্যক্তি যতই শীর্ষস্থানীয় এবং সম্মানার্হ হন না কেন। পক্ষপাতিত্ব করে শুধু মুহাম্মাদ ﷺ এর। পক্ষান্তরে অন্যান্য লোকেরা যারা আহলে হাদীস ও হাদীসের উপর আমলে সংযুক্ত ও সম্পৃক্ত নয়, তারা তাদের ইমামগণের উক্তির পক্ষপাতিত্ব করে -অথচ এমনটি করতে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও তারা তাঁদের পক্ষপাতিত্ব করে থাকে; যেমন আহলে হাদীসগণ তাদের নবীর উক্তির পক্ষপাতিত্ব করে। সুতরাং বিস্ময়ের কিছু নয় যে, তারাই হল সাহায্য প্রাপ্ত এবং মুক্তি প্রাপ্ত দল বা জামাআত।

৮। খতীব বাগদাদী তাঁর 'শারাফু আসহাবিল হাদীস' (আহলে হাদীসের মর্যাদা) নামক গ্রন্থে বলেন, 'রায় ওয়ালা' (মনগড়া মতকে প্রাধান্যদাতা) যদি ফলপ্রসূ ইলম অন্বেষণে ব্যাপৃত হত এবং বিশ্বজাহানের প্রতিপালকের রসূলের সুন্নাহসমূহ অনুসন্ধান করত, তবে সে সেই জিনিস অর্জন করতে পারত যা অন্যান্য থেকে তাকে অমুখাপেক্ষী করত। যেহেতু হাদীসে রয়েছে তওহীদের মৌলনীতি সমূহের পরিজ্ঞান, আগত বিভিন্নমুখী অঙ্গীকার ও

তিরস্কারের বিবৃতি; বিশ্বজগতের প্রতিপালকের গুণাবলী, জান্নাত ও জাহান্নামের আকৃতি বিষয়ক সংবাদ; তাতে সংযমী ও দুস্কৃতীদের জন্য আল্লাহ কি প্রস্তুত রেখেছেন তার খবর এবং আল্লাহ পৃথিবীসমূহে ও আকাশ-মন্ডলীতে কি সৃষ্টি করেছেন তারও খবর।

আর হাদীসে রয়েছে আম্বিয়াগণের কাহিনী, যাহেদ (সংসার-বিরাগী) ও আওলিয়াগণের বৃত্তান্ত, বাগ্মীদের ওয়ায, ফকীহগণের উক্তি, রসূলের খুতবা এবং তাঁর মু'জিযা (অলৌকিক ঘটনাবলী)। এতে রয়েছে কুরআন আযীম এবং তাতে উল্লেখিত মহাসংবাদ ও প্রজ্ঞাপূর্ণ উপদেশের ব্যাখ্যা ও সাহাবাদের নিকট হতে আহকামে (কর্মাকর্মে) সংরক্ষিত তাঁদের বাণী।

আল্লাহ আহলে হাদীসকে শরীয়তের রুক্ন (স্তম্ভ) করেছেন এবং তাদের দ্বারা প্রত্যেক নিকৃষ্ট বিদ্আতকে চিহ্নিত করেছেন। সুতরাং তারা সৃষ্টিজগতে আল্লাহর আমানতদার নবী ও তাঁর উম্মতের মাঝে মাধ্যম, তাঁর গ্রন্থের মূল পাঠ সংরক্ষণে প্রয়াসী। তাদের আলোক প্রদীপ্ত, তাদের মর্যাদা সমুন্নত, আসহাবে হাদীস ব্যতীত প্রত্যেক দলই ঐ সমস্ত খেয়াল খুশীর আশ্রয় নেয়, যার প্রতি তারা রুজু করে এবং যে রায়কে পছন্দ ও ভালো মনে করে, আর তার উপর তারা নির্বিচল থাকে।

কিতাব (কুরআন) তাদের সরঞ্জাম ও হাতিয়ার, সুন্নাহ তাদের হুজ্জত (অকাট্য দলীল), রসূল তাদের স্বীয় দল; তাঁর প্রতিই তাদের সম্বন্ধ। তারা রায়ের (মনগড়া মতের) প্রতি দৃকপাত করে না। যারা তাদের বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করেন এবং যারা তাদের প্রতি শত্রুতা করে আল্লাহ তাদেরকে উপেক্ষা করেন।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে আহলে হাদীসের দলভূক্ত কর। হাদীসের উপর আমল, তার অনুসারীদের প্রতি ভালোবাসা এবং তার নির্দেশ অনুযায়ী আমলকারীদের সহায়তা করার তওফীক দান কর। (আমীন)

তওহীদ ও তার প্রকরণ

যে ইবাদত করার জন্য আল্লাহ বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করেছেন, সেই ইবাদতে আল্লাহকে একক ও অদ্বিতীয় জানা ও মানার নাম তওহীদ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, আমার ইবাদতের জন্যই আমি মানুষ এবং জিনকে সৃষ্টি করেছি। ([1]) *(সূরা যারিয়াত ৫৬ অয়াত)* (অর্থাৎ আমি ওদেরকে কেবল এই জন্যই সৃষ্টি করেছি যে, ওরা ইবাদতের যোগ্য হিসাবে আমাকেই একক বলে মানবে এবং দুআ ও প্রার্থনার স্থল হিসাবে আমাকেই অদ্বিতীয় স্বীকার করবে।)

কুরআন কারীম হতে সংগৃহীত তওহীদের প্রকরণ নিম্নরূপঃ-

১। তওহীদুর রব্ব্ (প্রতিপালক বিষয়ে একত্ববাদ)। আর তা হল এই কথার স্বীকার যে, আল্লাহই বিশ্বজাহানের স্রষ্টা ও প্রতিপালক। অবশ্য একথা কাফেরদলও স্বীকার করেছে; কিন্তু এ স্বীকারোক্তি তাদেরকে ইসলামে প্রবিষ্ট করেনি। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, যদি তুমি ওদেরকে জিজ্ঞাসা কর যে, 'কে ওদেরকে সৃষ্টি করেছে?' তাহলে অবশ্যই ওরা বলবে, 'আল্লাহ।' *(সূরা যুখরুফ ৮৭ আয়াত)* বর্তমান যুগে কমিউনিষ্টরা প্রতিপালক (আল্লাহর) অস্তিত্বকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করে, তাই তারা জাহেলিয়াতের কাফেরদের চেয়েও বড় কাফের।

২। তওহীদুল ইলাহ (উপাস্য বিষয়ে একত্ববাদ)। আর তা হল সকল প্রকার বিধিবদ্ধ ইবাদত -যেমন, দুআ ও প্রার্থনা, সাহায্য প্রার্থনা, তওয়াফ,

---

(১) অত্র আয়াতটি সেই ব্যক্তির বিশ্বাসকে খন্ডন করে। যে মনে করে যে, কেবল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের জন্যই সারা বিশ্ব সৃজিত হয়েছে।

যবেহ, নযর ইত্যাদিতে আল্লাহকে একক মান্য করা। এই প্রকার তওহীদকেই কাফের দল অস্বীকার করেছিল, এবং এই তওহীদ নিয়েই নূহ ﷺ থেকে মুহাম্মাদ ﷺ পর্যন্ত সমস্ত রসূল ও তাঁদের উম্মতের মাঝে দ্বন্দ্ব ও বিবাদ ছিল। কুরআন কারীমের অধিকাংশ সূরাসমূহে এই তওহীদ এবং একমাত্র আল্লাহকেই (বিপদে-আপদে) ডাকা ও তাঁরই নিকট প্রার্থনা করার উপর মানুষকে অনুপ্রাণিত করা হয়েছে। যেমন সূরা ফাতেহায় আমরা পড়ে থাকি,

( )

অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি, তাই তোমাকেই কেবল আহবান করি এবং তুমি ব্যতীত আর কারো নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি না।

একমাত্র আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা, কুরআন দ্বারা মীমাংসা ও রাষ্ট্র পরিচালনা করা, শরীয়তের নিকটেই নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-প্রার্থী হওয়া, এ সব কিছু তওহীদুল ইলাহের শামীল। আর এর প্রত্যেকটাই আল্লাহর এই বাণীর আওতাভুক্ত যাতে তিনি বলেন,

( )

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি আল্লাহ, আমি ভিন্ন আর কোন (সত্য) উপাস্য নেই, সুতরাং তুমি আমারই উপাসনা কর। *(সূরা ত্বাহা ১৪ আয়াত)*

৩। তওহীদুল আসমা-ই অস্‌সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলী বিষয়ে একত্ববাদ); আর তা হল, কুরআন কারীম এবং সহীহ হাদীসে বর্ণিত সেই সমস্ত সিফাত বা গুণ, যার দ্বারা আল্লাহ নিজেকে গুণান্বিত করেছেন অথবা তাঁর রসূল ﷺ তাঁর জন্য বর্ণনা করেছেন তা বাস্তব ও প্রকৃত ভেবে, কোন প্রকারে তার অপব্যাখ্যা না করে, কোন উদাহরণ ও দৃষ্টান্ত কল্পনা না করে এবং তার প্রকৃতার্থ 'জানি না' বলে সে বিষয়ে আল্লাহকে ভারার্পণ না করে ঈমান ও প্রত্যয় রাখা। যেমন আল্লাহর আরশে আরোহণ, রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশে পৃথিবীর আকাশে তাঁর অবতরণ, তাঁর হস্ত, তাঁর আগমন ইত্যাদি গুণ। আমরা এ সবের সেই রূপ ব্যাখ্যা করব যে রূপ সলফ কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে। যেমন তাবেয়ীন কর্তৃক তাঁর সমারূঢ় হওয়ার ব্যাখ্যা সহীহ বুখারীতে বর্ণিত; আর তা এই যে, তিনি সারা সৃষ্টির ঊর্ধ্বে আরশের উপরে সমারূঢ়। যেমন

তাঁর মহিমা ও মহত্বের উপযুক্ত (এবং তা কারো সদৃশ নয়)। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১ আয়াত)*

ক। তা'বীল ঃ আয়াত ও সহীহ হাদীসের স্পষ্ট অর্থকে ভিন্ন কোন অসঙ্গত ও বাতিল অর্থে পরিবর্তন করাকে বলা হয়। যেমন, 'আল্লাহ আরশে সমারূঢ় আছেন। এর অর্থ এই করা যে, তিনি সার্বভৌম ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অধিকারী।'

খ। তা'ত্বীল (অর্থহীন, নিষ্ক্রিয় বা বিরহিতকরণ) ঃ আল্লাহর গুণাবলীকে অস্বীকার করা এবং তাঁকে (ঐ সমস্ত) গুণবিহীন ভাবাকে বলে। যেমন, আল্লাহর আকাশের উর্ধ্বে অবস্থানকে কিছু ভ্রষ্ট ফির্কাহ অস্বীকার করে ও বলে, 'আল্লাহ সকল স্থানেই আছেন!' (বা আল্লাহ মুমিনের হৃদয়ে আছেন।)

গ। তাক্য়ীফ (কেমনত্ব বর্ণনা করা)। আল্লাহর গুণাবলীর কেমনত্ব বর্ণনা করাকে বলে। যেমন বলা, 'তার রকমত্ব (হস্ত-পদ প্রভৃতি) এই রূপ।' সুতরাং আরশের উপর আল্লাহর আরোহণ করা তাঁর কোন সৃষ্টির আরোহণ করার মত নয় এবং তাঁর আরোহণ করার কেমনত্ব তিনি ব্যতীত আর কেউ জানে না।

ঘ। তামষীল (নমুনা বা দৃষ্টান্ত বর্ণনা করা)ঃ সৃষ্টির গুণাবলীর দ্বারা আল্লাহর গুণাবলীর দৃষ্টান্ত দেওয়া অথবা তাঁর গুণাবলীকে সৃষ্টির গুণাবলীর সহিত তুলনা করা। সুতরাং এ বলা বৈধ নয় যে, 'আমাদের অবতরণ করার মত আল্লাহ আকাশের প্রতি অবতরণ করেন।' অবতরণের হাদীসটিকে মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

আল্লাহর গুণকে সৃষ্টির গুণের সদৃশ ভাবার কথা শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহর প্রতি আরোপ করা এক মিথ্যা অপবাদ। যেহেতু আমরা তাঁর গ্রন্থাবলীতে একথার সত্যতার প্রমাণ পাইনি। বরং তিনি এই তাশবীহ ও তামষীলের (আল্লাহর গুণাবলী সৃষ্টির অনুরূপ হওয়ার কথা) খণ্ডন করেছেন এটাই আমরা পেয়েছি।

ঙ। 'তাফ}ীয' (ভারার্পণ করা) ঃ সলফগণ আল্লাহর গুণাবলীর কেমনত্ব বিষয়ের জ্ঞান তাঁর প্রতি সমর্পণ করেন এবং ঐ গুণাবলীর অর্থ বিষয়ক জ্ঞান তাঁর প্রতি সমর্পণ করেন না (যেহেতু সে সবের অর্থ তাঁদের নিকট স্পষ্ট ও বিদিত এবং কেমনত্ব অবিদিত)। উদাহরণ স্বরূপ 'ইসতিওয়া' (আরোহণ করা) এর অর্থ কোন কিছুর উর্ধ্বে অবস্থান বা আরোহণ করা যার কেমনত্ব আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না।

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ্'-র অর্থ

এর অর্থ 'আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য মা'বুদ (উপাস্য) নেই।' এতে রয়েছে সমস্ত গাইরুল্লাহ (আল্লাহ ব্যতীত সকল সৃষ্টি) হতে উপাস্যতার খন্ডন এবং তা কেবল আল্লাহরই জন্য প্রতিপাদন।

১- আল্লাহ তাআলা বলেন, ( )

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি জান যে, 'আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই।' *(সূরা মুহাম্মাদ ১৯ আয়াত)*

অতএব এই কলেমার অর্থ জানা ওয়াজেব এবং তা ইসলামের সমস্ত রুক্ন (স্তম্ভের) অগ্রে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বিশুদ্ধ-চিত্তে (ইখলাসের সহিত) "লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" বলবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

আর মুখলিস (বিশুদ্ধ-চিত্ত) সেই হতে পারে যে তার অর্থ বুঝে, তার দাবী অনুযায়ী কর্ম (আমল) সম্পাদন করে এবং অন্যান্য আমলের পূর্বে তার প্রতি মানুষকে আহ্বান করে (দাওয়াত দেয়)। যেহেতু এতেই রয়েছে সেই তওহীদ যার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে আল্লাহ বিশ্ব রচনা করেছেন।

৩। রসূল ﷺ-এর পিতৃব্য আবুতালেবের যখন মরণকাল উপস্থিত হয়, তখন তিনি তাঁকে বলেছিলেন, 'হে পিতৃব্য! আপনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলুন - এটা এমন এক কলেমা যাকে আল্লাহর নিকট আপনার (মুক্তির) জন্য দলীল

স্বরূপ পেশ করব।' কিন্তু তিনি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলতে অস্বীকার করলেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

৪। রসূল ﷺ তের বছর মক্কায় অবস্থান করে আরববাসীদের এই বলে আহ্বান করেছেন যে, তোমরা 'লা ইলা হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত আর কেউ সত্য উপাস্য নেই) বল। কিন্তু তারা বলেছিল, 'একটি মাত্র উপাস্য!? এরূপ তো আমরা কক্ষনো শুনিনি।'

কারণ আরবরা এর অর্থ বুঝেছিল। আর এও বুঝেছিল যে, এই বাণী যে বলবে, সে আল্লাহ ব্যতীত ভিন্ন কাউকে আহবান করতে পারে না। তাই তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল এবং বলেওনি। তাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, ওদের নিকট 'আল্লাহ ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই' বলা হলে ওরা অহংকারে অগ্রাহ্য করত এবং বলত, 'আমরা কি এক উম্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদেরকে বর্জন করব? বরং (মুহাম্মাদ) তো সত্য নিয়ে এসেছিল এবং সমস্ত রসূলের সত্যতা স্বীকার করেছিল। *(সূরা সাফ্ফাত, ৩৫-৩৭ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) বলবে এবং আল্লাহ ব্যতীত পূজ্যমান যাবতীয় ব্যক্তি ও বস্তুকে অস্বীকার ও অমান্য করবে তার জান ও মাল অবৈধ হয়ে যাবে।" *(মুসলিম)*

হাদীস শরীফটির মমার্থ এই যে, সাক্ষ্যবাণী উচ্চারণ করণের সাথে সাথে প্রত্যেক গায়রুল্লাহর ইবাদত -যেমন মৃত কবরবাসীদের নিকট কিছু প্রার্থনা ইত্যাদি- প্রত্যাখ্যান ও অস্বীকার করা একান্ত জরুরী।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় যে, কিছু মুসলিম ঐ কলেমা তাদের মুখে আবৃত্তি করে থাকে অথচ তাদের কর্মকান্ড ও আমল এবং গায়রুল্লাহকে ডাকা ও তার নিকট প্রার্থনা দ্বারা তারা ওর অর্থের বিরুদ্ধাচরণ করে !!

৫। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তওহীদ ও ইসলামের মূল ভিত্তি এবং জীবনের এক পূর্ণাঙ্গ নীতি; যা সকল প্রকার ইবাদত ও উপাসনাকে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে নিবেদন করার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হয়। আর তা তখন সম্ভব হয় যখন মুসলিম আল্লাহরই বিনীত আজ্ঞানুবর্তী হয়, একমাত্র তাঁকেই আহবান করে,

তাঁরই নিকট সবকিছু প্রার্থনা করে এবং সকল সংবিধানকে উপেক্ষা করে কেবল শরীয়তের সংবিধান ও কানুনকে বিচার-ভার সমর্পণ করে ও তারই মীমাংসাকে সাদরে মেনে নেয়।

৬। ইবনে রজব বলেন, 'ইলাহ (উপাস্য) তিনিই, যাঁর সম্ভ্রম ও সম্মানে, ভক্তি ও ভয়ে, যাঁর অনুগ্রহের আশায়, যাঁর উপর ভরসা রেখে, যাঁর নিকট যাচনা করে ও যাঁকে আহ্বান করে আনুগত্য করা হয় এবং বিরুদ্ধাচরণ না করা হয়। আর এ সমস্ত একমাত্র আল্লাহ ভিন্ন আর কারো জন্য উপযুক্ত নয়। সুতরাং যে ব্যক্তি কোন সৃষ্টিকে উপাস্যের বৈশিষ্ট্য ঐ বিষয়গুলির মধ্যে যে কোন একটিতেও (আল্লাহর শরীক করবে তার 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার বিশুদ্ধচিত্ততায় (ইখলাসে) ত্রুটি থেকে যাবে এবং তার মধ্যে সৃষ্টির দাসত্ব স্থানলাভ করবে। যে পরিমাণে ঐ শির্ক বৃদ্ধি করবে সেই পরিমাণে ঐ ত্রুটি এবং দাসত্ব ও বৃদ্ধি পেতে থাকবে।"

৭। কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' তার পাঠকারীকে উপকৃত করবে; যদি সে শির্ক দ্বারা তা নষ্ট না করে। তা করলে কলেমা সেই ব্যক্তির জন্য ঐ ওযুর মতই হবে যা অপবিত্রতা (বাতকর্ম ইত্যাদি)র কারণে নষ্ট হয়ে যায়।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির (জীবনে) শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে সে জান্নাত লাভ করবে।" *(হাসান, হাকেম বর্ণনা করেছেন।)*

'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'র অর্থ

'মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ'র অর্থ এই বিশ্বাস যে, তিনি আল্লাহর তরফ হতে প্রেরিত দূত ও রসূল। সুতরাং তিনি আমাদেরকে যে খবর দেন তা বিশ্বাস ও সত্যজ্ঞান করব, তিনি আমাদেরকে যা আদেশ করেন তাতে আমরা তাঁর আনুগত্য করব। তিনি আমাদেরকে যা নিষেধ করেন ও বাধা দেন তা আমরা বর্জন করব এবং তিনি যা বিধেয় করেছেন কেবল সেই অনুসারেই আমরা আল্লাহর ইবাদত করব।

শায়খ আবুল হাসান নদবী 'নবুওঅত' গ্রন্থে বলেন, 'প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক পরিবেশে আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালামগ)ণের সর্বপ্রথম দাওয়াত এবং সর্ববৃহৎ লক্ষ্য ছিল আল্লাহ তাআলা সম্বন্ধে আকীদাহ ও বিশ্বাসের সংশুদ্ধি, আল্লাহ ও তাঁর বান্দার মাঝে সম্পর্ক যথার্থকরণ, দ্বীন ও আনুগত্যকে আল্লাহরই জন্য বিশুদ্ধকরণের প্রতি আহ্বান, কেবলমাত্র আল্লাহরই জন্য ইবাদত ও উপাসনাকরণ, এবং (এই কথার জ্ঞানদান যে,) তিনিই একমাত্র উপকারী ও অপকারী, তিনিই ইবাদত, দুআ, শরণ প্রার্থনা, যবেহ ইত্যাদির একক অধিকারী। তাঁদের দাওয়াতী সংগ্রাম তাঁদের যুগে সেই পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে কেন্দ্রীভূত ছিল যা মূর্তি, ছবি এবং জীবিত ও মৃত সাধু-সজ্জনদের উপাসনা রূপে প্রচলিত ছিল।'

২। এই আমাদের রসূল, যাঁকে সম্বোধন করে তাঁর প্রভু বলেন,

)

(

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালো-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের (গায়বের) খবর জানতাম, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করে নিতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো শুধু মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী মাত্র।' *(সূরা আ'রাফ ১৮৮ আয়াত)*

রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না; যেমন খ্রিষ্টানরা মারয়্যাম-তনয়ের প্রশংসায় অতিরঞ্জন করেছিল। আমি তো একজন বান্দা মাত্র। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূলই বলো।" *(বুখারী)*

উক্ত হাদীসে ' ' শব্দের অর্থ হল, প্রশংসায় (না'তে) বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করা। অতএব আমরা তাঁর প্রশংসায় সীমালংঘন করব না এবং আল্লাহকে ছেড়ে তাঁকে উপাস্য বলে আহবান করব না; যেমন খ্রিষ্টানরা ঈসা বিন মারয়্যামের ব্যাপারে মাত্রাধিক প্রশংসায় অতিরঞ্জন করে (এবং তাঁকে মা'বুদের আসনে বসিয়েছিল) শির্কে আপতিত হয়েছিল। তাই আমাদেরকে

আমাদের রসূল শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা যেন কেবল বলি, 'মুহাম্মাদ আল্লাহর দাস এবং তাঁর প্রেরিত দূত।'

৩। একমাত্র আল্লাহকেই (বিপদে-আপদে) আহবান করা এবং তিনি ব্যতীত অন্য কাউকে আহবান না করা; যদিও তিনি রসূল হন অথবা কোন নৈকট্যপ্রাপ্ত অলী। এই নির্দেশে রসূল ﷺ-এর আনুগত্য করলে তাঁর মহব্বত ও প্রেম প্রকাশ হয়। তিনি বলেন, "যখন তুমি চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট চাও এবং যখন সাহায্য ভিক্ষা করবে তখন আল্লাহর নিকটেই সাহায্য ভিক্ষা করো।" *(তিরমিযী, তিনি এটিকে হাসান-সহীহ বলেছেন।)*

রসূল ﷺ কোন উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় পড়লে বলতেন, "হে চিরঞ্জীব! হে অবিনশ্বর! আমি তোমার রহমতের অসীলায় (তোমার নিকট) সাহায্যের আবেদন করছি।" *(তিরমিযী, হাদীসটি হাসান)*

আল্লাহ কবির প্রতি সদয় হন। তিনি বলেছেন,

'দূর হয়ে যাক বিপদ মোদের -আল্লাহর কাছেই চাই
আল্লাহ ছাড়া বিপত্তারণ আর তো কেহ নাই।'

( )
"আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি।"

১। আরবী সাহিত্যের উলামাগণ উল্লেখ করেন যে, উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা (না'বুদু ও নাসতাঈন) ক্রিয়ার পূর্বে (ইয়্যা-কা) কর্মকারককে অগ্রে উল্লেখ করেছেন যাতে ইবাদত কেবল তাঁরই জন্য ও সাহায্য প্রার্থনা কেবল তাঁরই নিকট নিরূপিত হয় এবং তা কেবল তাঁরই মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়।

২। অত্র আয়াত শরীফটি -যা মুসলিম নামাযে ও তার বাইরে প্রত্যহ বহুবার আবৃত্তি করে থাকে তা -সূরা ফাতিহার সারাংশ এবং সূরা ফাতিহা সমগ্র কুরআন মাজীদের সারাংশ ও নির্যাস।

৩। অত্র আয়াতে ইবাদত কথাটি ব্যাপক। যাতে সর্বপ্রকার ইবাদত ও উপাসনা যেমন নামায, নযর, যবেহ এবং বিশেষ করে দুআকে বুঝানো হয়েছে। যেহেতু নবী ﷺ বলেন, "দুআই হচ্ছে ইবাদত।" *(তিরমিযী, আর তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।)*

সুতরাং নামায যেমন এক প্রকার ইবাদত; যা কোন রসূল অথবা ওলীর জন্য নিবেদন করা বৈধ নয়, তেমনি দুআ (প্রার্থনা করা ও বিপদে ফরিয়াদ করা)ও এক প্রকার ইবাদত যা গায়রুল্লাহর জন্য নিবেদন করা অবৈধ। বরং তা শুধুমাত্র আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট। তিনি বলেন,

( )

অর্থাৎ, বল, 'আমি আমার প্রতিপালককেই কেবল ডাকি এবং তাঁর সহিত অন্য কাউকেও শরীক করি না।' *(সূরা জিন ২০ আয়াত)*

৪। প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, "মাছের উদরে অবস্থানকালে যুননূন (ইউনূস ﷺ) যে দুআ করেছিলেন সেই দুআ হল,

( )

(অর্থাৎ, তুমি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র। আমি নিশ্চয় অত্যাচারীদের দলভুক্ত।)

কোন মুসলিম যদি এই দুআ দ্বারা কখনো প্রার্থনা করে তবে আল্লাহ অবশ্যই তা মঞ্জুর করেন। *(হাকেম হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন এবং যাহাবী এতে একমত হয়েছেন।)*

কেবল আল্লাহ্‌রই নিকট সাহায্য চাও

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যখন তুমি কিছু চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট চাও এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহরই নিকট কর।" *(তিরমিযী এবং তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)*

১। ইমাম নওবী ও হাইতামী এই হাদীসের ব্যাখ্যায় যা বলেন তার সারাংশ এই যে, যখন তুমি তোমার ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কোন বিষয়ে সাহায্য চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট চাও। বিশেষ করে সেই সকল বিষয়ে আল্লাহর

নিকট সাহায্য-ভিক্ষা কর, যে সব বিষয়ে তিনি ব্যতীত অন্য কেউ সাহায্য করতে সক্ষম নয়। যেমন, রোগ-নিরাময়, রুজী ও হেদায়াত প্রার্থনা প্রভৃতি; যে সব দান কেবল আল্লাহর জন্যই নির্দিষ্ট।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, আর যদি আল্লাহ তোমাকে ক্লেশ দান করেন, তবে তিনি ব্যতীত আর কেউ তার মোচনকারী নেই। *(সূরা আনআম ১৭ আয়াত)*

২। যে ব্যক্তি হুজ্জত ও দলীল চায় তার জন্য কুরআন যথেষ্ট, যে ব্যক্তি রক্ষা ও সাহায্যকারী চায় তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, যে ব্যক্তি উপদেষ্টা চায় তার জন্য মৃত্যুই যথেষ্ট। আর যে ব্যক্তির জন্য এ সবের কিছুই যথেষ্ট নয়, তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট। আল্লাহ তাআলা বলেন, ( ) অর্থাৎ-আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? *(সূরা যুমার ৩৬ আয়াত)*

৩। শায়খ আব্দুল কাদের জীলানী 'আল-ফাতহুর রাব্বানী'তে বলেন, "আল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা কর এবং তিনি ব্যতীত অন্যের নিকট প্রার্থনা করো না ও কেবল আল্লাহর নিকটেই সাহায্য চাও এবং তিনি ব্যতীত আর কারো নিকট সাহায্য চেয়ো না। ধিক্ তোমাকে! তুমি কোন্ মুখ নিয়ে কাল তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করবে, অথচ দুনিয়াতে তুমি তাঁর বিরুদ্ধে কলহে লিপ্ত রয়েছ, তাঁর থেকে বিমুখ রয়েছ, তাঁর সৃষ্টির মুখাপেক্ষী হচ্ছ, তাঁর সহিত তাদেরকে শরীক (শির্ক) করছ, তাদের নিকট নিজের প্রয়োজন ভিক্ষা করছ এবং সংকটাপন্ন কর্মসমূহে তাদের উপর ভরসা করছ?! তোমাদের এবং আল্লাহর মাঝে সমস্ত মাধ্যম ও অসীলা তুলে ফেল; কারণ ওদের সহিত তোমাদের অবস্থান (বা ওদের পিছন ধরে থাকা) মূর্খতা। একমাত্র 'হক' (সত্য) আল্লাহ আযযা অজাল্ল ব্যতীত আর কারো জন্য কোন রাজত্ব, কোন আধিপত্য, কোন স্বনির্ভরতা, কোন সম্মান নেই। সৃষ্টিকে ছেড়ে স্রষ্টা 'হকে'র দিকে হয়ে যাও। (অর্থাৎ, আল্লাহর সৃষ্টির মধ্য হতে কাউকে মাধ্যম না করেই সরাসরি তাঁকে ডেকে তাঁর দিকে হয়ে যাও।)"

৪। বিধিসম্মত সাহায্য ভিক্ষা এই যে, নিজের বিপদ ও সংকট দূর করার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চাওয়া। আর অবৈধ শির্কী সাহায্য ভিক্ষা এই যে, বিপদ দূর করার জন্য গায়রুল্লাহ; যেমন, আম্বিয়া, মৃত অথবা জীবিত আওলিয়ার-নিকট সাহায্য চাওয়া। যেহেতু তাঁরা ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুরই মালিক নন এবং তাঁরা প্রার্থনা শুনতেও পান না। পক্ষান্তরে যদি শুনতেও পান তথাপিও তাঁরা আমাদের প্রার্থনা মঞ্জুর করতে পারেন না। যেমন এ বিষয়ে কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা রয়েছে। *(সূরা ফাত্বির ১৪ আয়াত দ্রঃ)*

পরন্তু উপস্থিত জীবিত ব্যক্তিবর্গের নিকট তাদের সাধ্যভুক্ত কর্মে; যেমন, মসজিদ নির্মাণ, আর্থিক অনটন প্রভৃতিতে সাহায্য প্রার্থনা করা বৈধ। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন, ( )

অর্থাৎ, তোমরা সৎ ও আল্লাহ-ভীতির কর্মে একে অন্যের সহায়তা কর। *(সূরা মায়েদাহ ২ আয়াত)*

আর মহানবী ﷺ বলেন, “আল্লাহ বান্দার সাহায্যে থাকেন, যতক্ষণ বান্দা তার ভায়ের সাহায্যে থাকে।” *(মুসলিম)*

উপস্থিত জীবিত ব্যক্তির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করার আরো দৃষ্টান্ত; যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, মূসার দলের লোকটি ওর শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার (মূসার) সাহায্য প্রার্থনা করল। *(সূরা কাসাস ১৫ আয়াত)*

ইয়া’জুজ ও মা’জুজের ক্ষতি হতে বাঁচতে প্রাচীর নির্মাণকল্পে লোকদের নিকট যুল ক্বারনাইনের শ্রম চাওয়ার ব্যাপারে আল্লাহ বলেন,

( )

অর্থাৎ, (যুল ক্বারনাইন বলল,)‘---সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর।’ *(সূরা কাহফ ৯৫ আয়াত)*

দয়াময় (আল্লাহ) আরশে সমারূঢ়

বহু সংখ্যক আয়াত, হাদীস এবং সলফের উক্তি আল্লাহর সৃষ্টির উর্ধ্বে থাকার কথা প্রমাণ করে।

১। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, তাঁর প্রতিই সৎবাক্য আরোহণ করে এবং সৎকর্মকে তিনি উত্থিত করেন। *(সূরা ফাত্বির ১০ আয়াত)*

২। তিনি আরো বলেন,

( )

অর্থাৎ, ---যিনি সোপান-শ্রেণীর মালিক। ফিরিশ্তা এবং রূহ তাঁর প্রতি উর্ধ্বগামী হবে---। *(সূরা মাআরিজ ৩-৪ আয়াত)*

৩। তিনি অন্যত্রে বলেন, ( )

অর্থাৎ, তুমি তোমার সুউচ্চ প্রতিপালকের পবিত্রতা ঘোষণা কর। *(সূরা আ'লা ১ আয়াত)*

৪। বুখারী (তাঁর সহীহ গ্রন্থে) কিতাবুত তাওহীদে আবুল আলিয়াহ ও মুজাহিদ হতে (নিম্নোক্ত) আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেছেন ঃ-

( ) (অতঃপর তিনি আকাশের প্রতি আরোহণ করেন) 'অর্থাৎ উর্ধ্বে হন এবং উপরে উঠেন।'

৫। আল্লাহ তাআলা বলেন, ( )

অর্থাৎ, দয়াময় আরশে আরোহণ করলেন। *(সূরা ত্বা-হা ৫ আয়াত)* [2] এর অর্থও (তিনি আরশের) উর্ধ্বে আছেন এবং (তার উপরে) উঠেছেন; যেমন তফসীরে ত্বাবারীতে এ কথার উল্লেখ এসেছে।

---

(২) আরশে আরোহণ করার কথা কুরআনে ৭ বার পুনরাবৃত্তি হয়েছে, যা এ বিষয়ে গুরুত্ব নির্দেশ করে।

৬। বিদায়ী হজ্জে আরাফার দিনে আল্লাহর রসূল ﷺ তাঁর ভাষণে বলেন, "শুনো! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" সকলে বলল, 'হ্যাঁ।' (অতঃপর) তিনি আকাশের দিকে অঙ্গুলী উত্তোলন করে এবং সকলের প্রতি তা নত করে বলেন, "হে আল্লাহ সাক্ষী থাকুন।" *(মুসলিম)*

৭। প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, "আল্লাহ সৃষ্টি সৃজন করার পূর্বে এক কিতাব লিখেছেন। (যাতে আছে) 'আমার ক্রোধ অপেক্ষা আমার করুণা অগ্রগামী।' সুতরাং তা তাঁর নিকট আরশের উপর লিপিবদ্ধ রয়েছে।"

৮। "তোমরা আমাকে বিশ্বাস কর না কি? অথচ আমি তাঁর নিকট বিশ্বস্ত যিনি আকাশে আছেন। আমার নিকট সকাল ও সন্ধ্যায় আকাশের খবর আসে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৯। ইমাম আওযায়ী বলেন, 'বহু সংখ্যক তাবেঈন বর্তমান থাকা কালীন সময়েও আমরা বলতাম, "আল্লাহ জাল্লা যিকরুহ আরশের উপরে আছেন। তাঁর যে সমস্ত সিফাত (গুণাবলী)র বর্ণনা সুন্নাহতে (হাদীসে) এসেছে আমরা তাতে ঈমান (বিশ্বাস) রাখি।' *(এটিকে বাইহাকী সহীহ সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন, দেখুন ফতহুল বারী)*

১০। ইমাম শাফেয়ী বলেন, 'আল্লাহ তাআলা আকাশে আরশের উপর আছেন। যেভাবে ইচ্ছা তিনি সৃষ্টির নিকটবর্তী হন এবং আল্লাহ যেভাবে চান পৃথিবীর আকাশের প্রতি অবতরণ করেন।' *(এটিকে হাকারী 'আকীদাতুশ শাফেয়ী'তে বর্ণনা করেছেন।)*

১১। ইমাম আবু হানীফাহ বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে, 'জানি না আমার প্রতিপালক আকাশে আছেন নাকি পৃথিবীতে' সে অবশ্যই কাফের হয়ে যায়। যেহেতু আল্লাহ বলেন, ( )

অর্থাৎ, "দয়াময় আরশে আরোহণ করলেন।" আর তাঁর আরশ সপ্তাকাশের উপরে। আবার সে যদি বলে, 'তিনি আরশের উপরেই আছেন', কিন্তু বলে, 'জানি না যে, আরশ আকাশে আছে নাকি পৃথিবীতে'-তাহলেও সে কাফের। কারণ সে একথা অস্বীকার করে যে তিনি আকাশে আছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তাঁর আকাশে থাকার কথা অস্বীকার করে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যায়। যেহেতু আল্লাহ সকল সৃষ্টির উর্ধ্বে আছেন এবং উপর দিকে মুখ করেই তাঁকে

ডাকা হয় (দুআ করা হয়), নিচের দিকে মুখ করে নয়।' *(শারহুল আকীদাতিত্ব ত্বাহাবিয়্যাহ ৩২২পৃষ্ঠা)*

১২। 'আল্লাহ কিভাবে আরশে সমারূঢ়?' -এ বিষয়ে ইমাম মালেক জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বলেছিলেন, 'আরোহণ করা বিদিত, এর কেমনত্ব অবিদিত, এর প্রতি ঈমান (বিশ্বাস) রাখা ওয়াজেব এবং এর কেমনত্ব প্রসঙ্গে প্রশ্ন তোলা বিদ্‌আত। আর এই (প্রশ্নকারী) বিদআতীকে (আমার মজলিস থেকে) বের করে দাও।'

১৩। 'ইস্‌তাওয়া' (আরোহণ করেছেন) এর তফসীর ও ব্যাখ্যা 'ইস্‌তাওলা' (ক্ষমতাসীন বা আধিপত্য বিস্তার করেছেন) করা বৈধ নয়। কারণ এরূপ ব্যাখ্যা সলফ কর্তৃক বর্ণিত হয়নি। আর তাঁদের নীতি ও পথ অধিকতম নিরাপদ, নিখুঁত, জ্ঞানগর্ভ, বলিষ্ঠ ও প্রজ্ঞাময়।

ইবনুল কাইয়েম আল-জাওযিয়্যাহ বলেন, "আল্লাহ ইয়াহুদকে 'হিত্ত্বাহ' বলতে আদেশ করেছিলেন, কিন্তু ইয়াহুদ তা বিকৃত করে 'হিন্‌ত্বাহ' বলেছিল। আল্লাহ আমাদেরকে জানিয়েছেন যে তিনি 'ইস্‌তাওয়া আলাল আরশ' (আরশে আরোহণ করেন) কিন্তু অপব্যাখ্যাকারীরা বলে, 'ইস্‌তাওলা' (ক্ষমতা ও আধিপত্য বিস্তার করেন)! সুতরাং লক্ষ্য করুন, এদের বর্ধিত ' ' এর সহিত ইয়াহুদীদের বর্ধিত ' ' এর কি সুন্দর মিল রয়েছে!!" *(এটিকে মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীত্বী ইবনে কাইয়েম আল-জাওযিয়্যাহ থেকে নকল করেছেন।)*

তওহীদের গুরুত্ব

১। আল্লাহ বিশ্বজগৎ রচনা করেছেন তাঁর ইবাদতের জন্য। তিনি বহু রসূল প্রেরণ করেছেন মানুষকে তাঁর তওহীদ (একত্ববাদের) প্রতি আহবান করার জন্য। কুরআন কারীম তার অধিকাংশ সূরাসমূহে তওহীদের আকীদাহ বর্ণনায় যত্নবান। বিভিন্ন স্থানে ব্যক্তি ও সমাজের জন্য শির্কের অপকারিতা বিবৃত

করেছে; যে শির্ক ইহকালে মানুষের ধ্বংসের এবং পরকালে জাহান্নামে চিরস্থায়ী হওয়ার কারণ।

২। সমস্ত রসূল প্রথমে তওহীদের দিকেই মানুষকে আহবান (দাওয়াত) করতে শুরু করেছেন; যে তওহীদ লোকমাঝে প্রচার ও তবলীগ করার জন্য আল্লাহ তাঁদেরকে আদেশ করেছিলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, আমি তোমার পূর্বে যে রসূলই প্রেরণ করেছি তার প্রতি এই প্রত্যাদেশই করেছি যে, 'আমি ছাড়া অন্য কোন সত্য উপাস্য নেই। সুতরাং তোমরা আমারই উপাসনা কর।' *(সূরা আম্বিয়া ২৫ আয়াত)*

আমাদের প্রিয় নবী ﷺ মক্কায় ২৩ বছর অবস্থান করে নিজ সম্প্রদায়কে আল্লাহর তওহীদ এবং সব কিছু ত্যাগ করে কেবল তাঁকেই ডাকা (ও কেবল তাঁরই নিকট প্রার্থনা করা)র প্রতি আহবান করেন। তাঁর প্রতি আল্লাহর অবতীর্ণ প্রত্যাদেশ ছিল,

( )

অর্থাৎ, বল, 'আমি কেবল আমার প্রতিপালককেই ডাকি এবং তাঁর সহিত কাউকেও শরীক করি না।' *(সূরা জিন ২০ আয়াত)*

রসূল ﷺ তাঁর অনুসারীবর্গকে শুরু ও শৈশব থেকেই তওহীদের উপর তরবিয়ত ও ট্রেনিং দিতে থাকলেন। তাই তো তিনি কিশোর পিতৃব্য-পুত্র আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস ﵄-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "যখন তুমি চাইবে তখন আল্লাহর কাছেই চেয়ো এবং যখন তুমি সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহর নিকটেই সাহায্য প্রার্থনা করো।" *(তিরমিযী)*

এই তওহীদই হল দ্বীন ইসলামের মৌলিক বিষয় এবং তার বুনিয়াদ। যে তওহীদ ব্যতিরেকে আল্লাহ অন্য কিছু কারো নিকট হতে গ্রহণ করবেন না।

৩। রসূল ﷺ নিজ সাহাবা ও সহচরবৃন্দকে শিখিয়ে ছিলেন যে, তাঁরা যেন মানুষকে দাওয়াত দেওয়ার সময় তওহীদকে সর্বাগ্রে পেশ করে। তাই মুআয ﷺ-কে ইয়ামান প্রেরণ করার সময় বলেছিলেন, "তাদেরকে তোমার দাওয়াতের প্রথম পর্যায় যেন "লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ" (আল্লাহ ছাড়া আর

কোন সত্য মা'বুদ নেই)এর সাক্ষ্যদান হয়।" অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, "(তোমার প্রথম দাওয়াত যেন) আল্লাহর তওহীদের প্রতি হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৪। 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ, মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য মা'বুদ নেই, মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল বা দূত) এই বাণীর সাক্ষ্য দানে তওহীদের প্রকৃত রূপ প্রস্ফুটিত হয়। এ বাণীর অর্থ হল, আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই এবং আল্লাহর রসূলের আনীত বিষয় ব্যতীত অন্য কিছু ইবাদত বা উপাসনা নয়। এই সেই বাণী ও সাক্ষ্য যার দ্বারা কাফের ইসলামে প্রবেশ করতে পারে। যেহেতু এই কলেমাই হচ্ছে জান্নাতের কুঞ্চিকা। এই কলেমা তার পাঠকারীকে জান্নাতে প্রবেশ করায় যদি সে নিজ কর্ম দ্বারা তা পণ্ড না করে তবে।

৫। কুরাইশের কাফের দল রসূল ﷺ-এর নিকট তওহীদের দাওয়াত ও মূর্তির বিরুদ্ধে কঠোর মন্তব্য ত্যাগ করার বিনিময়ে রাজ-সিংহাসন, অর্থ, বিবাহের জন্য সুন্দরীশ্রেষ্ঠা রমণী পেশ করেছিল। কিন্তু এতে তিনি সম্মত না হয়ে নিজ দাওয়াতে অটল ও নির্বিচল থাকলেন এবং নিজ সাহাবাবৃন্দ সহ নানা ক্লেশ সহ্য করলেন। অতঃপর ১৩ বছর পরে তওহীদের দাওয়াত বিজয়ী হল। এর পর মক্কা বিজয় হল এবং প্রতিমা ধ্বংস করা হল; যখন তিনি এই আয়াত পাঠ করেছিলেন,

( )

অর্থাৎ, সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, নিশ্চয় মিথ্যা বিলীয়মান। *(সূরা ইসরা' ৮১ আয়াত)*

৬। তওহীদ মুসলিমের জীবনে এক প্রধান কর্ম ও সাধনা। তাই তার জীবন শুরু করে তওহীদ দ্বারা আর তওহীদের মাধ্যমেই জীবনকে বিদায় করে। জীবনে তার ব্রত হল, তওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং তওহীদের প্রতি মানুষকে আহবান। যেহেতু তওহীদই মুমিন সমাজকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং তওহীদী বাণীর পতাকাতলে মানুষকে সমবেত করে।

আমরা আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করি, তিনি যেন কলেমা তওহীদকে ইহলোক ত্যাগের সময় আমাদের শেষ বাক্য করেন। (আমীন)

তওহীদের কিছু মাহাত্ম্য

১। আল্লাহ তাআলা বলেন,

(   )

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে যুল্‌ম দ্বারা কলুষিত করেনি, তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। *(সূরা আনআম ৮২ আয়াত)*

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন। 'এই আয়াত যখন অবতীর্ণ হল, তখন মুসলিমদের নিকট বিষয়টি কঠিন মনে হল। বলল, 'আমাদের মধ্যে কে আছে যে নিজের উপর যুল্‌ম (অন্যায়) করে না?' তা শুনে রসূল ﷺ বললেন, (তোমরা যে যুল্‌ম মনে করছ) তা নয়। বরং তা (সবচেয়ে বড় যুল্‌ম) কেবলমাত্র শির্ক। তোমরা কি পুত্রকে সম্বোধন করে লুকমানের উক্তি শ্রবণ করনি? (তিনি তাঁর পুত্রকে বলেছিলেন),

(   )

অর্থাৎ, হে বৎস্য! আল্লাহর সহিত শির্ক করো না, নিশ্চয় শির্ক বড় যুল্‌ম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অত্র আয়াতটি সেই তওহীদবাদী মুসলিমদেরকে সুসংবাদ দেয়, যারা তাদের ঈমানকে শির্ক দ্বারা কলুষিত করেনি। সেই সুসংবাদ এই যে, তাদের জন্য রয়েছে পরকালে আল্লাহর শাস্তি হতে পূর্ণ নিরাপত্তা এবং তারাই ইহকালে সুপথ প্রাপ্ত।

২। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "ঈমান ষাঠাধিক শাখাবিশিষ্ট। এর সর্বোত্তম শাখা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই) বলা এবং সর্বনিম্ন শাখা পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা।" *(মুসলিম)*

৩। মহামান্য শায়খ আব্দুল্লাহ খাইয়াত্বের গ্রন্থ "দলীলুল মুসলিম ফিল ই'তিক্বাদি অত্তাত্বহীর"-এ নিম্নরূপ বলা হয়েছে ঃ-

তওহীদ সুখের মূল কারণ এবং পাপ স্খালনকারী

কোন ব্যক্তি -যেহেতু সে মানুষ এবং নিষ্পাপ নয়- সেহেতু তার পদস্খলন ঘটতেই পারে ও আল্লাহর অবাধ্যাচরণে আপতিত হতেই পারে। পরন্তু সে যদি শির্কের কলুষমুক্ত বিশুদ্ধ তওহীদবাদী হয়, তাহলে তার আল্লাহর জন্য তাওহীদ এবং 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলায় তার ইখলাস (বিশুদ্ধ-চিত্ততা) তার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, পাপ মোচন এবং গোনাহর প্রায়শ্চিত্তের বৃহত্তম সহায়ক হবে। যেমন হাদীস শরীফে রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ (সত্য) উপাস্য নেই, তিনি একক, তাঁর কোন অংশী নেই, মুহাম্মাদ তাঁর দাস ও দূত (রসূল), ঈসাও আল্লাহর দাস, দূত এবং তাঁর 'বাণী' যা মারয়্যামের প্রতি প্রক্ষিপ্ত হয়েছিল এবং তাঁর তরফ হতে (বিশিষ্ট) রূহ, জান্নাত সত্য এবং জাহান্নাম সত্য - সে ব্যক্তি যে আমলই করে থাকুক, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অর্থাৎ, এই সাক্ষ্যবাণীর সমষ্টি যা মুসলিম উক্ত মৌলিক বিষয়সমূহ উল্লেখ করে উচ্চারিত করে থাকে তা তার সুখদায়ক জান্নাত প্রবেশের কারণ অবশ্যই হবে- যদিও তার কিছু কর্ম ত্রুটি ও অবহেলাপূর্ণ হয়। যেমন হাদীসে কুদসীতে এর বর্ণনা এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলেন, "হে আদম সন্তান! তুমি যদি প্রায় পৃথিবী-পূর্ণ পাপ নিয়ে আমার নিকট উপস্থিত হও আর আমার সহিত কোন কিছুকে শরীক না করে আমার সাথে সাক্ষাৎ কর, তবে আমিও প্রায় পৃথিবী-বরাবর ক্ষমা নিয়ে তোমার নিকট উপস্থিত হব।" *(হাসান, তিরমিযী ও যিয়া')*

অর্থাৎ, তুমি যদি প্রায় পৃথিবী-পূর্ণ পাপ ও অন্যায় করে থাক, কিন্তু তোমার মরণ তওহীদের উপর হলে আমি তোমার সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেব।

অন্য এক হাদীসে এসেছে যে, "যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক না করে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে এবং যে ব্যক্তি কোন কিছুকে আল্লাহর শরীক করে তাঁর সহিত সাক্ষাৎ করে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(মুসলিম)*

উক্ত হাদীসসমূহের প্রত্যেকটি হতে তওহীদের মাহাত্ম্য ও গুরুত্ব প্রতীয়মান হয় এবং এ কথা স্পষ্ট হয় যে, তওহীদ বান্দার চিরসুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের বৃহত্তম সহায়ক এবং পাপক্ষালনের শ্রেষ্ঠতম মাধ্যম।

তওহীদের কতিপয় উপকারিতা

ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে বিশুদ্ধ তওহীদ বাস্তবায়িত হলে তাতে উৎকৃষ্টতম ফল লাভ হয়। এর কিছু ফল নিম্নরূপ ঃ-

১। আল্লাহ ছাড়া বিভিন্ন বস্তু, ব্যক্তি বা সৃষ্টির পদানতি ও দাসত্ব থেকে মানুষের মুক্তি; যে সৃষ্টি কোন কিছু সৃজন করতে পারে না বরং তারা নিজেই সৃষ্ট; যারা নিজেদের মঙ্গলামঙ্গলের মালিক নয় এবং জীবন, মৃত্যু ও পুনরুত্থানের উপরেও কোন ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং তওহীদ সুঠাম আকৃতিতে সৃষ্টিকর্তা প্রতিপালক ছাড়া অন্য সকল কিছুর দাসত্ব হতে মানুষকে স্বাধীনতা দান করে। বাতিল চিন্ত-ধারা ও কুসংস্কার হতে মস্তিষ্ক মুক্ত করে। পদানতি, হীনতা ও পরবশ্যতা হতে হৃদয়-মনকে অব্যাহতি দেয় এবং সর্বপ্রকার ফেরাউন, বাতিল প্রভু, গণকদল ও আল্লাহর বান্দাদের উপর খোদায়ী দাবীদারদের আধিপত্য হতে মানব জীবনকে নিস্কৃতি দেয়। তাই তো মুশরিক (অংশীবাদী)দের দলপতিরা এবং জাহেলিয়াতের দুর্দম স্বেচ্ছাচারীরা সাধারণভাবে সকল আম্বিয়ার ও বিশেষভাবে শেষ রসূল ﷺ-এর দাওয়াতের ঘোর বিরোধিতা করেছে এবং তা প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে। যেহেতু তারা জানত যে, 'লা ইলাহা'র অর্থই হচ্ছে মানুষের মুক্তি, মিথ্যা সিংহাসন হতে পরাক্রমশালী-দেরকে বিচ্যুতকরণ এবং মুমিনদের সেই ললাটসমূহ সুউন্নতকরণের এক সাধারণ ঘোষণা, যে ললাটসমূহ একমাত্র বিশ্বজাহানের মহান প্রতিপালক ছাড়া অন্য কিছুর নিকট অবনত হয় না।

২। ভারসাম্যপূর্ণ সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব গঠন। তওহীদ সুসমঞ্জস ব্যক্তিত্ব-গঠনে সহায়তা করে; যে ব্যক্তিত্বের গতিমুখ ও লক্ষ্য জীবনে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ এবং যার উদ্দেশ্য ও গন্তব্য-স্থলও একটাই। তাই তার একক উপাস্য ব্যতীত আর

কোন উপাস্য নেই। নির্জনে ও প্রকাশ্যে সে যাঁর অভিমুখী এবং সুখে ও দুখে যাঁকে সে আহবান করে থাকে। পক্ষান্তরে মুশরিক, যার অন্তরকে অসংখ্য উপাস্য ও মা'বুদ বিভক্ত করে নিয়েছে। ফলে কখনো সে জীবিতের মুখাপেক্ষী হয় আবার কখনো মৃতের। এরই দিকে লক্ষ্য করে হযরত ইউসুফ আলাইহিস সালাম বলেছিলেন,

( )

অর্থাৎ, হে কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন একাধিক প্রতিপালক শ্রেয়, নাকি এক পরাক্রমশালী আল্লাহ? *(সূরা ইউসুফ ৩৯ আয়াত)*

সুতরাং মুমিন একই উপাস্যের উপাসনা করে। সে জানে যে, কি তাঁকে সন্তুষ্ট করে এবং কি অসন্তুষ্ট করে। তাই সে ঐ কর্মই করে, যাতে তিনি সন্তুষ্ট এবং এতে তার হৃদয় প্রশান্ত থাকে। আর মুশরিক বহু সংখ্যক মাবুদের ইবাদত করে; একজন তাকে ডানে নিয়ে যেতে চায় এবং অপরজন বামে। ফলে সে সবার মাঝে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ও অস্বচ্ছন্দ হয়ে পড়ে; যার কোন স্থিরতা থাকে না।

৩। তওহীদ নিরাপত্তার উৎস। যেহেতু তওহীদ তওহীদবাদীর হৃদয়কে নিরাপত্তা ও শান্তিতে পরিপূর্ণ করে দেয়। তাই সে আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করে না। রুজী-রুটি, নিজের আত্মা ও আত্মীয়-পরিজনের উপর ভয়ের সমস্ত ছিদ্রপথ সে বন্ধ করে থাকে। মানুষ, জিন, মৃত্যু ইত্যাদি হতে ভয় এবং আরো অন্যান্য সকল ভয় হতে সে নির্ভয় থাকে। কারণ তওহীদবাদী মুমিন একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কাউকেও ভয় করে না। তাই আপনি তাকে দেখবেন যে, মানুষ যখন ভীত-সন্ত্রস্ত তখন সে অকুতোভয় এবং সকলে যখন উদ্বিগ্ন ও অস্থির তখন সে প্রশান্ত ও স্থিরচিত্ত।

এই অর্থের প্রতিই কুরআন করীমে ইঙ্গিত করা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে অন্যায় (শির্ক) দ্বারা কলুষিত করেনি তাদের জন্যই তো রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সুপথপ্রাপ্ত। *(সূরা আনআম ৮২ আয়াত)*

অবশ্য এই নির্বিঘ্নতা চিত্তের অভ্যন্তর হতে নিঃসৃত ও অনুভূত হয়, প্রহরীর প্রহরা হতে নয়। আর এটা হল ইহলৌকিক নিরাপত্তা। পরন্তু পারলৌকিক নিরাপত্তা তো সর্ববৃহৎ ও চিরস্থায়ী। কারণ তারা কেবল আল্লাহর জন্য একনিষ্ঠ ও বিশুদ্ধ-চিত্ত এবং তারা তাদের তওহীদকে শির্কের কলুষ দ্বারা সংমিশ্রিত করেনি। যেহেতু শির্ক করা বড় যুল্ম।

৪। তওহীদ আত্মিক শক্তির উৎপত্তিস্থল। যেহেতু তওহীদ তওহীদবাদীকে দুর্দান্ত আধ্যাত্মিক ও সামাজিক বল দান করে। কারণ তার আত্মা-মন আল্লাহর সকাশে আশা, আস্থা, ভরসা, তাঁর লিখিত ভাগ্যের উপর সন্তুষ্টি, তাঁর তরফ হতে আগত বিপদের উপর ধৈর্য, তাঁর সৃষ্টি হতে অমুখাপেক্ষিতা দ্বারা পরিব্যাপ্ত। তাই সে পর্বতের ন্যায় সুদৃঢ় অটল। পরন্তু যখন তার উপর কোন বিপদ আসে তখন সে স্বীয় প্রভুর নিকট তা হতে উদ্ধার চায়। আর কোন মৃতের নিকট বিপদ মুক্তি চায় না। যেহেতু তার আদর্শ বচন হল, নবী ﷺ-এর এই বাণী "যখন তুমি কিছু চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট চাও এবং সাহায্য প্রার্থনা করলে আল্লাহরই নিকট কর।" *(তিরমিযী, তিনি বলেন, হাসান সহীহ)*

এবং আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

( )

অর্থাৎ, আর আল্লাহ যদি তোমাকে বিপদে ফেলেন তাহলে তিনি ছাড়া তা মোচনকারী আর কেউ নেই। *(সূরা আনআম ১৭ আয়াত)*

৫। তওহীদ ভ্রাতৃত্ব এবং সাম্যের মূল ভিত্তি। যেহেতু তওহীদ তওহীদবাদী-দেরকে একথার অনুমতি দেয় না যে, তারা আল্লাহকে ছেড়ে একে অপরকে নিজেরদের প্রভু বানিয়ে নিক। কারণ উপাস্যত্বের অধিকারী একমাত্র আল্লাহ এবং সমগ্রমানবকূল ও তার শীর্ষস্থানে মুহাম্মদ ﷺ তাঁর রসূল এবং নির্বাচিত ও মনোনীত নবী ও তাঁর দাস। *(ডক্টর ইউসুফ আল-কারযাবীর গ্রন্থ 'হাক্বীক্বাতুত তাওহীদ' হতে কিছু রদবদলের সহিত সংগৃহীত)*

তওহীদের দুশমন

আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, এরূপে শয়তান মানুষ ও জিনদেরকে আমি প্রত্যেক নবীর শত্রু করেছি, যারা প্রতারণার উদ্দেশ্যে একে অন্যকে চমকপ্রদ বাক্য দ্বারা প্ররোচিত করে থাকে। *(সূরা আনআম ১১২ আয়াত)*

আল্লাহর হিকমত চেয়েছে যে, তিনি আম্বিয়া ও তওহীদের দাওয়াত পেশকারীদের বিরুদ্ধে কিছু শয়তান জিনকে শত্রু নির্ধারণ করেছেন যারা ভ্রষ্টতা, অমঙ্গল ও বাতিল কথা দ্বারা শয়তান মানুষদেরকে প্ররোচিত করে থাকে। যাতে তারা মানুষকে ভ্রষ্ট করে দেয় এবং তাদেরকে সেই তওহীদ হতে ব্যাহত করে; যার প্রতি আম্বিয়াগণ স্ব-স্ব সম্প্রদায়কে সর্বপ্রথম আহবান করেছেন। কারণ এই তওহীদ হল সেই আসল বুনিয়াদ, যার উপর ইসলামী দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত।

কিন্তু আশ্চর্যের কথা যে, কিছু লোক তওহীদের দাওয়াতকে উম্মাহর মাঝে বিছিন্নতা সৃষ্টির কারণ বলে গণ্য করে। অথচ তওহীদই উম্মাহর মাঝে ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টির কারণ। 'তওহীদ' (একত্ববাদ)এর নামই সেই কথার নির্দেশ করে।

পক্ষান্তরে মুশরিকদল যারা 'তাওহীদুর রবূবিয়্যাহ' (প্রতিপালকের একত্ব-বাদ)কে স্বীকার করেছিল এবং মেনে নিয়েছিল যে, আল্লাহই তাদের সৃষ্টিকর্তা। কিন্তু 'তাওহীদুল উলূহিয়্যাহ' (উপাস্যত্বের একত্ববাদ)কে অর্থাৎ কেবলমাত্র

আল্লাকেই ডাকতে অস্বীকার করেছিল এবং তারা তাদের আওলিয়াকে ডাকা ও তাদের নিকট প্রার্থনা করা বর্জন করেনি। রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম তাদেরকে দুআ ও ইবাদতে আল্লাহর তওহীদ (একত্ববাদ)কে স্বীকার করতে ও মেনে নিতে আহবান করলে তারা তাঁর সম্পর্কে বলেছিল,

( )

অর্থাৎ, সে কি সমস্ত উপাস্যকে এক উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে ? এতো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার! *(সূরা স্বাদ ৫ আয়াত)*

পূর্ববর্তী উম্মতদের প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, এরূপে এদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রসূল এসেছে ওরা তাকে বলেছে, '(তুমি তো) এক যাদুকর অথবা পাগল!' ওরা কি একে অপরকে এই মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বরং ওরা সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়। *(সূরা যারিয়াত ৫২ আয়াত)*

মুশরিকদের চরিত্র এই যে, তারা যখন এক আল্লাহকেই ডাকার কথা শোনে, তখন তাদের হৃদয় সংকীর্ণ হয়ে যায় এবং অনীহ ও চকিত হয়ে উঠে। ফলে (তওহীদবাদীদেরকেই) কাফের বলে অভিহিত করে এবং তাদেরকে বাধা দিতে প্রয়াস পায়। পক্ষান্তরে যখন তারা শির্ক এবং আল্লাহ ভিন্ন অন্য কাউকে ডাকার কথা শোনে, তখন তারা উৎফুল্ল ও আনন্দিত হয়। আল্লাহ তাআলা ঐ মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন,

)

(

অর্থাৎ, যখন 'আল্লাহ এক' এ কথার উল্লেখ করা হয়, তখন যারা পরকালে বিশ্বাসী নয় তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় সংকুচিত হয় এবং আল্লাহর পরিবর্তে অন্যান্য বাতিল উপাস্যদের উল্লেখ করা হলে তারা আনন্দে উল্লসিত হয়। *(সূরা যুমার ৪৫ আয়াত)*

তওহীদ অস্বীকারকারী মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করে আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, তোমাদের এ শাস্তি তো এজন্য যে, যখন 'আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই' বলা হয়েছে তখন তোমরা অবিশ্বাস করেছ এবং তাঁর সহিত শরীক করা হলে তা বিশ্বাস করেছ, সুতরাং সুউচ্চ, সুমহান আল্লাহরই সমস্ত কর্তৃত্ব। *(সূরা মুমিন ১২ আয়াত)*

অত্র আয়াতগুলি কাফেরদের প্রসঙ্গে হলেও তা সেই ইসলামের দাবীদারদের উপরেও প্রযোজ্য যারা ওদের গুণে গুণান্বিত। যারা তওহীদের দাওয়াত পেশকারীদের বিরুদ্ধে লড়াই করে, তাঁদের উপর মিথ্যা অপবাদ দেয় এবং ঘৃণ্য খেতাবে তাঁদেরকে অভিহিত করে ; যাতে তাঁদের নিকট হতে মানুষকে দূরে রাখতে সক্ষম হয় এবং সেই তওহীদ হতে মানুষকে সাবধান করে ও দূরে রাখে, যে তওহীদের কারণেই আল্লাহ তার সমস্ত রসূল প্রেরণ করেছেন। ওদের মধ্যে এমনও ব্যক্তি আছে যারা আল্লাহর নিকট দুআ ও প্রার্থনা করতে শুনলে বিনত হয় না অথচ তিনি ছাড়া অন্য কারো নিকট দুআ ও প্রার্থনা করতে শুনলে; যেমন রসূল বা আওলিয়াদের নিকট মদদ চাইতে শুনলে বিনয়াবনত ও উল্লসিত হয়।!! সুতরাং তারা যা করে তা কত নিকৃষ্ট!

তওহীদ প্রসঙ্গে উলামার ভূমিকা

উলামা আম্বিয়ার উত্তরাধিকারী। সকল নবী প্রথম যে কথার প্রতি আহবান করেন তা হল তওহীদ। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন,

( )

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যে রসূল প্রেরণ করেছি এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আল্লাহরই ইবাদত কর এবং তাগূত বর্জন কর। *(সূরা নাহল ৩৬ আয়াত)*

(তাগূত বলা হয় প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে, যাকে আল্লাহর পরিবর্তে পূজা ও মান্য করা হয় এবং সে উক্ত পূজায় সম্মত ও সন্তুষ্ট থাকে।)

এই জন্যই আলেম সমাজের উচিত তাই দিয়ে দাওয়াত শুরু করা; যা দিয়ে রসূলগণ করেছিলেন। অতএব দাওয়াতের প্রারম্ভে মানুষকে সকল প্রকার ইবাদতে বিশেষ করে দুআ ও প্রার্থনা করাতে আল্লাহর তওহীদের (আল্লাহকে একক উপাস্য মানার) প্রতি আহবান করা কর্তব্য। যেহেতু দুআ সম্পর্কে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দুআই তো ইবাদত।" *(তিরমিযী এবং তিনি এটিকে হাসান বলেছেন।)*

বর্তমানযুগে অধিকাংশ মুসলমান শির্ক এবং গায়রুল্লাহকে ডাকাতে এবং তাদের নিকট প্রার্থনা ও আবেদন করাতে অভ্যাসী হয়ে পড়েছে। যা তাদের এবং পূর্ববর্তী জাতির দুর্দশার মূল কারণ। যে সব জাতি সমূহকে -আল্লাহর পরিবর্তে আওলিয়াগণকে ডাকার কারণে -তিনি ধ্বংস করে দিয়েছেন।

তওহীদ প্রতিষ্ঠা এবং শির্ক উচ্ছেদকরণের প্রতি উলামা-গণের বিভিন্ন প্রকার ভূমিকা পরিদৃষ্ট হয়ঃ-

১। প্রথম প্রকার উলামা যাঁরা তওহীদ, তার গুরুত্ব ও প্রকারভেদ উপলব্ধি করেছেন, শির্ক ও তার প্রকারভেদ জেনেছেন। অতঃপর তাঁরা তাঁদের কর্তব্য পালনে সক্রিয় হয়েছেন। তওহীদ ও শির্ক মানুষের নিকট খোলাখুলি ও স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। যাঁদের দলীল কুরআন কারীম এবং সহীহ সুন্নাহ (হাদীস)। এই শ্রেণীর উলামাগণ মিথ্যা অপবাদের সম্মুখীন হয়েছেন যেমন আম্বিয়াগণ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা পশ্চাৎপদ না হয়ে ধৈর্যের সাথে স্বকর্তব্য পালন করেছেন। তাঁদের আদর্শ নীতিবাক্য হচ্ছে, আল্লাহ তাআলার বাণী,

( )

অর্থাৎ, লোকে যা বলে, তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে ওদেরকে উপেক্ষা করে চল। *(সূরা মুযযাম্মিল ১০ আয়াত)*

প্রাচীনকালে লুকমান হাকীম তাঁর পুত্রকে অসিয়ত করে বলেছিলেন,

)

(

অর্থাৎ, হে বৎস! যথাযথভাবে নামায পড়বে, সৎকাজের নির্দেশ দেবে, অসৎকাজে বাধা দান করবে এবং বিপদে ও কষ্টে ধৈর্য ধারণ করবে। নিশ্চয় এসব দৃঢ় সংকল্পের কাজ। *(সূরা লুকমান/১৭ আয়াত)*

২। দ্বিতীয় প্রকার উলামা যাঁরা তওহীদের প্রতি দাওয়াতকে উপেক্ষা ও অবহেলা করেছেন, যে তওহীদ হল ইসলামের মূল বুনিয়াদ। ফলে তারা মুসলিমদের আকীদাহ ও বিশ্বাস সংশোধন না করে তাদেরকে নামাযে যত্নবান হতে, আল্লাহর বিধান রাষ্ট্রে প্রতিষ্ঠা (কল্পে সংগঠন) করতে এবং তাঁর পথে জিহাদ করতে আহ্বান করেছেন। (অর্থাৎ বিনা ভিত্তিতে ইমারত গড়ার প্রচেষ্টা করেছেন।) যেন তাঁরা আল্লাহ তাআলার এই বাণী শ্রবণ করেননি,

(...)

অর্থাৎ, ওরা যদি শির্ক করত, তবে ওদের সকল কৃতকর্ম পন্ড হয়ে যেত। *(সূরা আনআম ৮৮ আয়াত)*

অথচ তাঁরা যদি রসূলগণের মত অন্যান্য আমলের পূর্বে তওহীদকে অগ্রণী করতেন তাহলে তাঁদের দাওয়াত সাফল্যমন্ডিত হত এবং আল্লাহ তাঁদেরকে সাহায্য করতেন যেমন নবী ও রসূলগণকে তিনি সাহায্য করেছেন। তিনি বলেন,

)

(

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনে এবং সৎকাজ করে আল্লাহ তাদেরকে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তিনি অবশ্যই পৃথিবীতে তাদেরকে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন যেমন তিনি তাদের পূর্ববর্তীদেরকে প্রতিনিধিত্ব দান করেছিলেন। তিনি অবশ্যই তাদের জন্য তাদের দ্বীনকে -যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন -সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার উপাসনা করবে, আর আমার সহিত কিছুকে অংশী স্থাপন করবে না। অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই সত্যত্যাগী (ফাসেক)। *(সূরা নূর ৫৫ আয়াত)*

সুতরাং বিজয়ের বুনিয়াদী শর্ত হল তওহীদ প্রতিষ্ঠাকরণ।

৩। তৃতীয় প্রকার উলামা ও দাওয়াত পেশকারী, যাঁরা লোকেদের আক্রমণের ভয়ে অথবা নিজ চাকুরী, পদ বা গদি যাবার ভয়ে তওহীদের প্রতিষ্ঠা ও শির্ক উম্মুলনকল্পে দাওয়াত ত্যাগ করে বসেছেন। আর এতে তাঁরা সেই ইল্ম (জ্ঞান) গুপ্ত করেছেন যা মানুষের মাঝে প্রচার করতে আদিষ্ট ছিলেন। ফলে আল্লাহর এই বাণী তাঁদের জন্য নিরূপিত হয়েছে,

)

(

অর্থাৎ, আমি যেসব স্পষ্ট নিদর্শন ও পথ-নির্দেশ অবতীর্ণ করেছি, মানুষের জন্য খোলাখুলিভাবে কিতাবে আমার ব্যক্ত করার পরও যারা ঐ সকল গোপন রাখে। আল্লাহ তাদেরকে অভিশাপ দেন এবং অভিশাপদাতারাও তাদেরকে অভিশাপ দেয়। *(সূরা বাক্বারাহ ১৫৯ আয়াত)*

যাঁরা দ্বীনের দাওয়াত দেন তাঁদের বাঞ্ছনীয় গুণ প্রসঙ্গে আল্লাহ তাআলা বলেন,

(...)

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর বাণী প্রচার করে, তাঁকে ভয় করে এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কাউকে ও ভয় করে না। *(সূরা আহযাব ৩৯ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন ইল্ম (জ্ঞান) গোপন করে আল্লাহ তার মুখে আগুনের লাগাম দেবেন।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

৪। চতুর্থ প্রকার উলামা ও পীরের দল; যাঁরা তওহীদের প্রতি দাওয়াত, একমাত্র আল্লাকেই ডাকা এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন নবী, ওলী বা মৃতকে না ডাকার নীতির বিরোধিতা করেন। কারণ এঁদের নিকট নবী-ওলীকে ডাকা (অসীলা করা) বৈধ তাই। যে আয়াতে গায়রুল্লাহকে ডাকতে নিষিদ্ধ ও সাবধান করা হয়েছে সেই আয়াতকে এঁরা কেবল (অমুলিম) মুশরিকদের জন্য নিরূপিত করেন এবং মনে করেন যে, মুসলমানদের মধ্যে মুশরিকদের পর্যায়ভুক্ত কেউ নেই! যেন তাঁরা আল্লাহ তাআলার এই বাণী শ্রবণ করেননি,

( )

অর্থাৎ, যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমানকে কোন যুল্‌ম দ্বারা কলুষিত করেনি তাদের জন্যই রয়েছে নিরাপত্তা এবং তারাই সৎপথপ্রাপ্ত। *(সূরা আনআম ৮২ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে যুলমের অর্থ হল শির্ক। এর দলীল আল্লাহর এই বাণী,

( )

অর্থাৎ ঃ- অবশ্যই শির্ক মহা যুল্‌ম। *(সূরা লুক্বমান ১৩ আয়াত)*

সুতরাং উল্লেখিত আয়াতে একথাই সুস্পষ্ট হয় যে, মুসলিম এবং মু'মিনও শির্কে আপতিত হয়; যেমন বহু মুসলিম বিশ্বের মুসলিমদের বর্তমান পরিস্থিতি। পক্ষান্তরে ওঁরা, যাঁরা নবী-ওলীকে বিপদে ডাকা বা অসীলা মানা বৈধ বলে মানুষকে ফতোয়া দেন, মসজিদের ভিতর মৃত সমাধিস্ত করা, কোন ওলীর কবরের তওয়াফ করা, আওলিয়াদের নামে নযর-নিয়ায পেশ করা প্রভৃতি বিদআত ও শরীয়ত-বিরোধী আচরণকে বৈধ ও সমীচীন বলে ঘোষণা করেন - তাঁদের ব্যাপারে রসূল ﷺ মুসলিমকে সাবধান ও সতর্ক করেছেন; তিনি বলেন, "আমি আমার উম্মতের উপর ভ্রষ্টকারী ইমাম (আলেম ও নেতা প্রভৃতি)র দলকেই ভয় করি।" *(সহীহ, তিরমিযী)*

আযহারের এক প্রয়াত ওস্তাদকে কবরের প্রতি সম্মুখ করে নামায বৈধতার প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করা হলে উত্তরে তিনি বলেছিলেন, 'কবরের প্রতি সম্মুখ করে নামায বৈধ হবে না কেন? এই দ্যাখেন না, রসূলুল্লাহর কবর মসজিদের ভিতরেই এবং লোকেরা তাঁর কবরের প্রতি মুখ করে নামায পড়ে থাকে!'

অথচ রসূল ﷺ-এর দাফন মসজিদের ভিতর হয়নি বরং আয়েশা (রাঃ)এর হুজরায় তাঁকে সমাধিস্থ করা হয়েছিল। পরন্তু তিনি কবরের প্রতি সম্মুখ করে নামায পড়তে নিষেধ করে গেছেন।

রসূল ﷺ দুআ করতেন,

.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি সেই ইল্‌ম হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি, যা কোন লাভ দেয় না। *(মুসলিম)* (অর্থাৎ এমন ইল্‌ম হতে পানাহ চাচ্ছি যা আমি অপরকে শিখাই না, যার উপর আমল করি না এবং যার দ্বারা আমার চরিত্রও পরিবর্তিত হয় না।)

৫। যারা আপন মুরশিদ ও হুজুরদের কথাই অন্ধভাবে মান্য করে থাকে এবং আল্লাহর অবাধ্যাচরণ করে তাঁদের আনুগত্য ও অনুকরণ করে বস্তুতঃ তারা রসূল ﷺ-এর এই বাণীর বিরুদ্ধাচরণ করে। তিনি বলেন, "স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

অবশ্যই এই আনুগত্যের দরুন তারা কিয়ামতে লাঞ্ছিত হবে। আর তখন লাঞ্ছনা কোন উপকার দেবে না। কাফেরদল ও তাদের পথ অনুসরণকারীদের শাস্তি বর্ণনা করে আল্লাহ বলেন,

)

(

অর্থাৎ, যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমন্ডল উল্টে-পাল্টে দগ্ধ করা হবে সেদিন ওরা বলবে, 'হায়! আমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করতাম।' তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের প্রভু! আমরা আমাদের নেতা ও বুযুর্গদের আনুগত্য করেছিলাম এবং ওরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল ; হে আমাদের প্রতিপালক! ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিন এবং মহা-অভিসম্পাত করুন।' *(সূরা আহযাব ৬৬-৬৮ আয়াত)*

উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় ইবনে কাসীর বলেন, "অর্থাৎ, আমরা আমাদের আমীর (নেতা) এবং উলামা ও পীর-বুযুর্গদের অনুকরণ, আর রসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম। আমরা বিশ্বাস করেছিলাম যে, ওদের নিকট কিছু আছে এবং ওরা কিছুর উপর প্রতিষ্ঠিত আছে। (অর্থাৎ প্রকৃত সত্য ওদের নিকটেই আছে এবং ওরা প্রকৃত সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আজ দেখছি,) ওরা কিছুরই উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না।"

ওয়াহাবীর অর্থ কি ?

লোকেরা প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকেই 'ওয়াহাবী' বলে অভিহিত করে থাকে, যে ব্যক্তি তাদের প্রথা ও অভ্যাস, বিশ্বাস ও বিদআতের বিরোধিতা করে যদিও তাদের ঐ সকল বিশ্বাস অমূলক ও ভ্রষ্ট ; যা কুরআন কারীম ও সহীহ হাদীস

সমূহের পরিপন্থী। বিশেষ করে তওহীদের কথা বললে এবং অন্যান্যকে ছেড়ে কেবল একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে নির্দেশ দিলে তারা ঐ খেতাব দিয়ে থাকে।

একদা এক আলেমের নিকট 'আল-আরবাঈন আন-নওবীয়্যাহ' গ্রন্থ হতে ইবনে আব্বাসের এই হাদীস পড়েছিলাম; নবী ﷺ বলেন, "যখন চাইবে, তখন আল্লাহরই নিকট চাও এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহরই নিকট কর।" *(তিরমিযী, এবং তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।)*

নওবীর ব্যাখ্যা আমার বড় পছন্দ হল ; তিনি বলেন, '--- অতঃপর যে প্রয়োজন মানুষ ভিক্ষা করে তা পূরণ করার ক্ষমতা যদি সৃষ্টির হাতে না থাকে, যেমন সুপথ (হেদায়াত) ও ইল্ম (জ্ঞান) প্রার্থনা, আরোগ্য ও নিরাপত্তা ভিক্ষা ইত্যাদি, তাহলে তা প্রতিপালকের নিকটই চাইবে। পক্ষান্তরে সৃষ্টির নিকট চাওয়া এবং তাদের উপর ভরসা করা নিন্দনীয়।'

অতঃপর আমি ঐ মওলানাকে বললাম, 'এই হাদীস এবং এর ব্যাখ্যা গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা অবৈধ হওয়ার প্রতি নির্দেশ করে।' তিনি আমাকে বললেন, 'বরং (গায়রুল্লাহর নিকটেও সাহায্য ভিক্ষা করা) বৈধ।' আমি বললাম, 'আপনার দলীল কি?' এতে তিনি ক্রোধান্বিত হয়ে উচ্চ কণ্ঠে বললেন, 'আমার ফুফু বলেন, 'হে (বাবা) শায়খ সা'দ সাহেব!' (অথচ তিনি তাঁর মসজিদে সমাধিস্থ, ফুফু তাঁর নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন।) আমি তাঁকে বলি, 'ফুফুজান! (বাবা) শায়খ সা'দ সাহেব কি আপনার উপকার করতে পারবেন? ফুফু বলেন, 'আমি উনার নিকট প্রার্থনা করি। উনি এ ব্যাপারে আল্লাহর প্রতি মধ্যস্থতা করেন, যাতে তিনি আমাকে রোগমুক্ত করে দেন!!'

আমি শায়েখকে বললাম, 'আপনি একজন আলেম মানুষ! বই পঠন-পাঠনে বয়স অতিবাহিত করে ফেলেছেন, তা সত্ত্বেও এসব কিছুর পরে আপনি আপনার অজ্ঞ ফুফুর নিকট আকীদাহ গ্রহণ করেছেন?!' তখন তিনি আমাকে বললেন, 'তোমার নিকট ওয়াহাবী চিন্তাধারা আছে। তুমি ওমরা করতে যাও, আর ওয়াহাবী বই পুস্তক বয়ে নিয়ে আস!!!'

আমি অবশ্য ওয়াহাবী সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। তবে হুজুরদের মুখে বহুবার বলতে শুনেছি। হুজুররা তাদের সম্পর্কে বলেন, 'ওয়াহাবীরা সমস্ত মানুষের বিরুদ্ধে, ওরা আওলিয়া এবং তাঁদের কারামতকে বিশ্বাস করে না,

রসূলের প্রতি ওদের মহব্বত নেই' ইত্যাদি মিথ্যা অপবাদ! তখন আমি মনে মনে বলতাম, ওয়াহাবীরা যদি একমাত্র আল্লাহর নিকটেই সাহায্য ভিক্ষা করাতে এবং আরোগ্যদাতা একমাত্র আল্লাহ -এই কথাতে বিশ্বাসী হন, তাহলে তাঁদের সম্পর্কে পরিচয় লাভ করা আমার একান্ত জরুরী। 'সে জামাআত কোথায়' জিজ্ঞাসা করলে সকলে বলল, 'ওদের এক নির্দিষ্ট স্থান আছে, যেখানে ওরা প্রত্যেক বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় জমায়েত হয়ে তফসীর, হাদীস ও ফিক্হ অধ্যয়ন করে।'

আমি আমার ছেলেদেরকে সঙ্গে নিয়ে কয়েকটি শিক্ষিত যুবককে সাথে করে তাঁদের নিকট গিয়ে উপস্থিত হলাম। এক বৃহৎ কক্ষে প্রবেশ করে দর্সের অপেক্ষায় বসলাম। ক্ষণেক পরেই এক বয়স্ক শায়খ কক্ষে প্রবেশ করতেই আমাদেরকে সালাম দিলেন এবং তাঁর ডান দিকে হতে শুরু করে সকলের সাথে মুসাফাহা করলেন। অতঃপর তিনি তাঁর বসার স্থানে বসলেন। তাঁর জন্য কেউই উঠে দণ্ডায়মান হয়নি। আমি মনে মনে বললাম, 'ইনি তো বড় বিনয়ী শায়খ, দন্ডায়মান হওয়া (কিয়াম) পছন্দ করেন না বুঝি।' অতঃপর

...

বলে তিনি তাঁর দর্স শুরু করলেন। খুতবাটি শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন, যে খুতবা রসূল ﷺ পাঠ করে তাঁর ভাষণ ও দর্স আরম্ভ করতেন। অতঃপর আরবী ভাষায় কথা বলতে শুরু করলেন। হাদীস উল্লেখ করলে তার শুদ্ধ-অশুদ্ধতা এবং বর্ণনাকারীর অবস্থা বর্ণনা করেন। নবী ﷺ-এর নাম এলেই তাঁর উপর দরূদ পাঠ করেন। পরিশেষে কাগজে লিখিত কতকগুলি প্রশ্ন তাঁকে করা হল। তিনি কুরআন ও সুন্নাহ থেকে উদ্ধৃত দলীল সহ উত্তর দিলেন। উপস্থিত ব্যক্তিবর্গের কেউ কেউ তাঁর সহিত বাদানুবাদও করলেন। কোন প্রশ্নকারীকে উত্তর না দিয়ে তিনি ফিরিয়ে দিলেন না। অতঃপর দর্সের শেষে বললেন, 'আল্লাহর শত প্রশংসা যে, আমরা মুসলিম ও সালাফী। ([3]) কিছু লোক বলে

(৩) সালাফীঃ যারা সলফে সালেহ (রসূল ও সাহাবা)র পথ অনুসরণ করেন।

থাকে আমরা ওয়াহাবী। অথচ এটা হল নামের খেতাব বের করা যা থেকে আল্লাহ আমাদেরকে নিষেধ করেছেন ; তিনি বলেন,

(...)

অর্থাৎ, আর তোমরা এক অপরের মন্দ খেতাব বের করো না। *(সূরা হুজুরাত ১১ আয়াত)*

পূর্ব যুগে লোকেরা ইমাম শাফেয়ীকে রাফেযী ([4]) বলে অপবাদ দিলে তিনি তাদের প্রতিবাদে বলেছিলেন,

'মুহাম্মদের বংশধরের প্রতি ভালবাসা রাখা
যদি 'রফ্য' (রাফেযী হওয়া) হয়
তাহলে মানব-দানব সাক্ষী থাকুক যে, আমি রাফেযী।'

তদনুরূপ আমাদেরকে যারা ওয়াহাবী বলে অপবাদ দেয় তাদের প্রতিবাদে এক কবির মত বলি যে,

'আহমদের (ﷺ) অনুসারী যদি ওয়াহাবী হয়,
তাহলে আমি স্বীকার করছি যে, আমি একজন ওয়াহাবী।'

অতঃপর দর্স শেষ হলে কিছু যুবকের সহিত আমরা বের হয়ে এলাম। তাঁর ইল্ম ও বিনয় দেখে আমরা বিস্মিত হলাম। এক যুবককে বলতে শুনলাম, 'উনিই হচ্ছেন প্রকৃত শায়খ!'

তওহীদের দুশমনরা তওহীদবাদীকে 'ওয়াহাবী' বলে অভিহিত করে। এতে তারা মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব এর প্রতি সম্বন্ধ করে। অথচ সত্য ও সঠিক বললে তাঁর নাম মুহাম্মাদ এর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে 'মুহাম্মদী' বলত। আল্লাহর ইচ্ছা তাই 'ওয়াহহাবী' 'ওয়াহহাব' এর প্রতি সম্বদ্ধ হয়েছে; যা আল্লাহর সুন্দরতম নামাবলীর অন্যতম নাম।

একজন সূফী যদি এমন এক জামাআতের সহিত সম্বন্ধ রাখে যারা 'সূফ' (পশমবস্ত্র) পরিধান করে (ফলে তাকে সূফী বলা হয়), তাহলে একজন 'ওয়াহহাবী' ও 'আল-ওয়াহাহ্হাব'-এর প্রতি সম্বন্ধ রেখে (গর্ব অনুভব করতে পারে)। যেহেতু আল-ওয়াহাহ্হাব' (মহাদাতা) হলেন আল্লাহ। যিনি

---

(৪) রাফেযাহঃ শিআহ সম্প্রদায়ের একটি ফির্কার নাম। (অনুবাদক)

তাকে তওহীদ দান করেছেন এবং তওহীদের দাওয়াত পেশ করতে তাকে সক্ষম ও সুদৃঢ় করেছেন।

মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব

শায়খ মুহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব নজদের (সউদী আরবের রাজধানী রিয়ায থেকে প্রায় ৫০ কিমি পশ্চিমে) উয়্যাইনাহ্ শহরে ১১১৫ হিজরী সনে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স দশ বছর হওয়ার পূর্বেই কুরআন হিফয করেন। আপন পিতার নিকট হাম্বলী ফিক্হ অধ্যয়ন করেন এবং দেশের বিভিন্ন শায়খদের নিকট হাদীস ও তফসীর পাঠ করেন। বিশেষ করে মদীনা নববিয়্যার উলামাদের নিকট (শরীয়তের জ্ঞান লাভ করেন)। কিতাব ও সুন্নাহ হতে তওহীদকে বুঝেন। অতঃপর তিনি নিজ দেশ নাজদে এবং যে সব দেশ তিনি ভ্রমণ করেন সেখানে শির্ক, কুসংস্কার, বিদআত এবং সঠিক ইসলামের পরিপন্থী কবরপূজা দেখে শঙ্কিত হলেন। নিজ দেশের অনূঢ়া যুবতীদের দেখলেন, তারা ষাঁড়া খর্জুর বৃক্ষের অসীলায় প্রার্থনা করছে, বলছে, 'ওহে ষাঁড়া বনস্পতি! বছর না ঘুরতেই চাই আমি পতি!' হিজাযে দেখলেন, সাহাবাবর্গ, আহলে বায়ত এবং রসূলের কবরসমূহ ভক্তির আতিশয্যে পবিত্ররূপে পূজিত হচ্ছে -যে ভক্তি ও উপাসনা পাওয়ার অধিকারী একমাত্র আল্লাহ। মদীনায় তিনি শুনলেন, আল্লাহর পরিবর্তে রসূল ﷺ-এর নিকট লোকে সাহায্য প্রার্থনা করছে; যা কুরআন ও রসূলের বাণীর পরিপন্থী। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডেকো না; যা তোমার উপকারও করে না এবং অপকারও করে না, কারণ এ করলে তুমি যালেম (মুশরিক)-দের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। *(সূরা ইউনূস ১০৬ আয়াত)*

রসূল ﷺ স্বীয় পিতৃব্য-পুত্রকে সম্বোধন করে বলেন, 'যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট চাও এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহরই নিকট কর।" *(তিরমিযী এবং তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।)*

শায়খ একমাত্র আল্লাহকে ডাকতে এবং তওহীদ বরণ করে নিতে মানুষকে আহ্বান করতে আরম্ভ করলেন। যেহেতু আল্লাহই সর্বশক্তিমান এবং সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা। আর বাকী সকল সৃষ্টি নিজের ও অপরের অমঙ্গল দূরীকরণে অক্ষম। আর যেহেতু সালেহীন (আওলিয়া)র মহব্বত তাঁদের অনুসরণ করে প্রকাশ হয়, আল্লাহ ও নিজেদের মাঝে তাঁদেরকে অসীলা বা মাধ্যম মেনে এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাঁদেরকে আহবান করে নয়।

১- বাতিলপন্থীদের বিরোধিতা ঃ-

যে তওহীদী দাওয়াতের গুরুভার শায়খ গ্রহণ করেছিলেন তার বিরুদ্ধে বিদআতীরা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াল। অবশ্য এটা আশ্চর্যের কিছু নয়, যেহেতু তওহীদের দুশমনরা রসূল ﷺ-এর যুগেও ঐ দাওয়াতের বিরোধিতা করেছিল। তারা বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছিল,

( )

অর্থাৎ, ওকি সকল মা'বূদকে একই মা'বূদ বানিয়ে নিয়েছে? এতো আশ্চর্যের ব্যাপার! *(সূরা স্বাদ ৫ আয়াত)*

শায়খের শত্রুরা তাঁর বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব-বিগ্রহ শুরু করে দিল। তাঁর প্রসঙ্গে মিথ্যা অপবাদ প্রচার করতে লাগল। তাঁকে হত্যা করে তাঁর ঐ দাওয়াত হতে নিষ্কৃতিলাভের জন্য ষড়যন্ত্র করল। কিন্তু আল্লাহ তাঁর হিফাযত করলেন এবং তাঁর জন্য এক সহায়ক নিযুক্ত করে দিলেন। যার ফলে হিজায ও অন্যান্য মুসলিম দেশে তওহীদী দাওয়াত প্রচার ও প্রসার লাভ করল।

কিন্তু অদ্যাবধি কিছু লোক সেই মিথ্যা অপবাদ প্রচারে ব্যস্ত। ওরা বলে, তিনি পঞ্চম আরো এক নতুন মযহাব প্রবর্তন করেছেন, অথচ তাঁর মযহাব হল হাম্বলী। ওরা আরো বলে, ওয়াহাবীরা রসূলকে ভক্তি করে না বা ভালোবাসে না ও তাঁর উপর দরূদ পড়ে না। অথচ শায়খ রাহেমাহুল্লাহ 'মুখতাসারু সীরাতির রসূল ﷺ' নামে এক গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। যা এ কথারই দলীল যে, তিনি

রসূল ﷺ-কে ভালোবাসেন। ওরা তাঁর নামে আরো বিভিন্ন অপবাদ ও কুৎসা রটিয়ে থাকে, যে সম্পর্কে কাল কিয়ামতে ওদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

পক্ষান্তরে যদি ওরা ইনসাফের সাথে উদার মনে তাঁর কিতাবসমূহ অধ্যয়ন করত, তবে নিশ্চয় তাতে কেবল কুরআন, হাদীস ও সাহাবাবর্গের উক্তিই দেখতে পেত।

এক সত্যবাদী ব্যক্তি আমাকে জানান যে, এক আলেম তাঁর দর্সে লোকদেরকে ওয়াহাবী থেকে সাবধান করতেন। উপস্থিতগণের মধ্য হতে এক ব্যক্তি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাবের লিখা একটি পুস্তক লেখকের নাম সহ প্রথম পৃষ্ঠা ছিঁড়ে তাঁকে পড়তে দিলেন। তিনি তা পড়ে পছন্দ করলেন। অতঃপর যখন লেখক সম্পর্কে জানলেন তখন তিনি তাঁর প্রশংসা করতে লাগলেন।

২। হাদীসে বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন, "হে আল্লাহ! তুমি আমাদের শাম ও ইয়ামানে বর্কত (প্রাচুর্য) দান কর।" সকলে বলল, 'আর আমাদের নজদে?' তিনি বললেন, "ওখান হতে শয়তানের শৃঙ্গ উদিত হবে।" *(বুখারী, মুসলিম)*

ইবনে হাজার আস্কালানী প্রভৃতি ওলামাগণ উল্লেখ করেন যে, হাদীসে উল্লেখিত ঐ নজদ হল ইরাকের নজদ। সুতরাং ইরাকেই যত বড় বড় ফিতনা ফাসাদের প্রাদুর্ভাব ঘটে। হুসাইন বিন আলী ﷺ ওখানেই শহীদ হন। কিন্তু এর বিপরীত, কিছু লোক মনে করে উক্ত 'নজদ' বলতে হিজাযের 'নজদ'কে বুঝানো হয়েছে। অথচ সেখানে কোন ফিতনাহ দেখা দেয়নি যেমন ইরাকে বহু ফিতনা দেখা দিয়েছে। বরং হিজাযের নজদ থেকে তো সেই তওহীদের সংস্কার সাধন হয়েছে যার কারণে বিশ্বজগৎ রচিত এবং যার কারণে আল্লাহ তাআলা যুগে যুগে রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন। (৫)

৩। কিছু ন্যায়পরায়ণ উলামা উল্লেখ করেন যে, শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহহাব হলেন হিজরী দ্বাদশ শতাব্দীর মুজাদ্দিদ (ইসলামী সংস্কারক)। অনেকে তাঁর প্রসঙ্গে বহু বই-পুস্তকও রচনা করেন। ঐ লেখকদের মধ্যে শায়খ আলী ত্বানত্বাবী অন্যতম, যিনি ঐতিহাসিক আদর্শ ও প্রতিভাবান মহাপুরুষ-

---

(৫) এখন যদি বিশুদ্ধ তওহীদের দাওয়াতকে কেউ ফিতনা মনে করে তবে ন্যায় পরায়ণ জ্ঞানীর নিকট ফিতনাবায কে তা সহজে অনুমেয়।(অনুবাদক)

দের প্রসঙ্গে এক ধারাবাহিক পুস্তক রচনা করেছেন। যাঁদের মধ্যে তিনি শায়খ মুহাম্মাদ বিন আব্দুল ওয়াহ্হাব এবং আহমদ বিন ইরফানের নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি ঐ পুস্তকে ঐ কথাও উল্লেখ করেন যে, ভারতে তওহীদের আকীদা পৌঁছে মুসলিম হাজীগণের মাধ্যমে যাঁরা মক্কায় হজ্জ করতে এসে ঐ আকীদায় প্রভাবান্বিত হয়ে দেশে ফিরেন। পরে ইংরেজ ও ইসলাম-দুশমনরা ঐ আকীদার বিরুদ্ধে বাধ সাধে। কারণ ঐ আকীদায় তাদের বিরুদ্ধে সমস্ত মুসলিমকে ঐক্যবদ্ধ করতে শুরু করেছিল। তাই অর্থলোভী স্বার্থপর (মুসলিম)দের মাধ্যমে পরোক্ষভাবে তাঁদের বদনাম করতে প্রয়াস চালায়। ফলে তওহীদের প্রতি আহবানকারী প্রত্যেক তওহীদবাদীর নাম (তুচ্ছভাবে) 'ওয়াহাবী' রাখে [6] এবং এইরূপ বলে কোন অভিনব দ্বীন প্রবর্তক (বিদআতী) রূপে তাঁকে চিহ্নিত করতে চায়। যাতে মুসলিমরা তাদের মূল তওহীদের আকীদা থেকে ফিরে আসে, যে আকীদা তাদেরকে কেবল এক আল্লাহকে ডাকার প্রতি আহবান করে। কিন্তু সে নির্বোধরা একথা বুঝতে পারেনি যে, 'ওয়াহাবী' শব্দটি 'আল-ওয়াহহাব'এর সহিত সম্বদ্ধ; যা আল্লাহর পবিত্র নামাবলীর অন্যতম নাম। (যার অর্থ মহাদাতা) যিনি তাকে (ওয়াহাবীকে) তওহীদ দান করেছেন এবং তার বিনিময়ে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

তওহীদ ও শির্কের সংঘর্ষ

তওহীদের সহিত শির্কের সংঘর্ষ প্রাচীন। এ সংঘর্ষ প্রথম শুরু হয় সেই রসূল নূহ ﷺ-এর যুগে যখন তিনি তাঁর সম্প্রদায়কে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করার এবং মূর্তিপূজা বর্জন করার প্রতি আহবান করেন। তাদের মাঝে সাড়ে নয়শত বছর অবস্থান করে তওহীদের দাওয়াত দিতে থাকলেন। কিন্তু তাদের প্রতিবিধান ছিল -যেমন কুরআন উল্লেখ করে,

( )

(৬) যা ইতিহাসে 'ওয়াহাবী আন্দোলন' বলে সুপরিচিত ও প্রসিদ্ধ। (অনুবাদক)

অর্থাৎ, ওরা বলল, 'তোমরা তোমাদের দেব-দেবীকে পরিত্যাগ করো না; অদ্দ, সুয়া, য়্যাগূস, য়্যাউক ও নাস্‌রকে।' ওরা অনেককে বিভ্রান্ত করেছে। *(সূরা নূহ ২৩-২৪ আয়াত)*

ইমাম বুখারী ইবনে আব্বাস ﷺ হতে এই আয়াতের ব্যাখ্যা বর্ণনা করেন যে, এগুলি নূহ সম্প্রদায়ের (৫টি) নেক লোকের নাম ছিল। যখন তাঁরা পরলোক গমন করলেন, তখন শয়তান তাঁদের সম্প্রদায়কে কুমন্ত্রণা দিয়ে উদ্বুদ্ধ করল যে, 'ওঁরা যে মজলিসে উপবেশন করতেন সে মজলিসে ওঁদের মূর্তি নির্মাণ করে সংস্থাপন কর এবং ওঁদের নাম অনুসারে প্রত্যেকের নাম রেখে দাও।' লোকেরা তাই করল। তখন তাঁদের পূজা করা হত না। কিন্তু যখন ঐ লোকেরা মারা গেল এবং ঐশী-জ্ঞান বিস্মৃত হল তখন ঐ মূর্তিসমূহের পূজা শুরু হয়ে গেল।

২। অতঃপর নূহ ﷺ-এর পর আরো বহু রসূল এলেন। তাঁরা স্ব-স্ব সম্প্রদায়কে একমাত্র আল্লাহরই ইবাদত করতে এবং বাতিল মা'বুদসমূহের ইবাদত বর্জন করতে আহবান করলেন যারা ইবাদতের যোগ্য ছিল না। শুনুন কুরআন কি বলছে। সে আপনাকে খবর দেবে--

( )

অর্থাৎ, এবং আদ জাতির নিকট ওদের ভ্রাতা হূদকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর। তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন মাবুদ নেই। তোমরা কি সাবধান হবে না ?' *(সূরা আ' রাফ ৬৫ আয়াত)*

( )

অর্থাৎ, এবং সামূদ জাতির প্রতি তাদের ভ্রাতা সালেহকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর; তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন উপাস্য নেই।' *(সূরা হূদ ৬১ আয়াত)*

( )

অর্থাৎ, এবং মাদয়্যানবাসীদের নিকট তাদের ভ্রাতা শুআইবকে প্রেরণ করেছিলাম। সে বলেছিল, 'হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের জন্য অন্য কোন মা'বুদ নেই।' *(সূরা হূদ ৮৪ আয়াত)*

)

(

অর্থাৎ, স্মরণ কর, ইব্রাহীম তাঁর পিতা ও সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই ; সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন।' *(সূরা যুখরুফ ২৬-২৭ আয়াত)*

কিন্তু যুগে যুগে মুশরিকরা দ্বন্দ্ব, প্রতিবাদ এবং সর্বপ্রকার শক্তি ও সামর্থ্য ব্যয় করে সংঘর্ষ দ্বারা সকল আম্বিয়াগণকে প্রতিহত করার চেষ্টা করেছে।

৩। আমাদের প্রিয় রসূল ﷺ; যিনি নবুয়তের পূর্বে আরবের নিকট সত্যবাদী বিশ্বস্ত বলে সুপরিচিত ছিলেন। কিন্তু যখন তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদত ও তওহীদ বরণ এবং পিতৃপুরুষদের পূজ্যমান উপাস্যসমূহ বর্জন করতে আহবান করলেন, তখন সকলে তাঁর সত্যবাদিতা ও বিশ্বস্ততাকে ভুলে বসল। বরং উল্টো তাঁকে 'যাদুকর মিথ্যুক' বলে অভিহিত করল। কুরআন তাদের প্রতিক্রিয়া বর্ণনা করে বলে,

)

(

অর্থাৎ, এরা আশ্চর্যান্বিত যে, এদেরই মধ্য হতে এদের নিকট একজন সতর্ককারী এল! এবং কাফেররা বলল, 'এ তো এক যাদুকর, মিথ্যাবাদী। এ কি বহু উপাস্যের পরিবর্তে একটি মাত্র উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? এ তো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপ্যার!' *(সূরা স্বাদ ৪-৫ আয়াত)*

)

(

অর্থাৎ, এরূপে এদের পুর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রসূল এসেছে, তখনই ওরা তাকে বলেছে, '(তুমি তো) এক যাদুকর অথবা পাগল।' ওরা কি একে অপরকে এ মন্ত্রণাই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ ওরা এক সীমালংঘন-কারী সম্প্রদায়। *(সূরা যারিয়াত ৫২আয়াত)*

এই তো তওহীদের দাওয়াতের ক্ষেত্রে সকল রসূলের ভূমিকা এবং অপর পক্ষে তাঁদের মিথ্যায়নকারী ও অপবাদ আরোপকারী সম্প্রদায়দের এই ভূমিকা!

৪। আমাদের বর্তমান যুগে মুসলমান যদি মানুষকে সদাচরণ, সত্যবাদিতা ও আমানতদারী প্রভৃতির প্রতি দাওয়াত দেয়, তাহলে তার কোন বিরোধী দৃষ্ট হয় না। কিন্তু যখন সে সেই তওহীদের প্রতি আহবান করে; যে তওহীদের প্রতি রসূলগণ আহবান করে গেছেন -আর তা হল একমাত্র আল্লাহকে ডাকা এবং তিনি ছাড়া আম্বিয়া, আওলিয়া যাঁরা আল্লাহরই দাস তাঁদেরকে না ডাকা -তখন লোকে তার বিরোধিতা শুরু করে দেয়, তার নামে মিথ্যা অপবাদ রটায় এবং বলে, 'ও তো ওয়াহাবী!!' আর এই বলে তার দাওয়াত থেকে মানুষকে বাধা দান করে। এমন কি ওদের নিকট কোন এমন আয়াত পাঠ করা হয় যাতে তওহীদের উল্লেখ আছে, তবে তা শুনে ওদের কেউ কেউ বলে, 'এটা ওয়াহাবী আয়াত!!'

অনুরূপ ওদের নিকট "যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহরই নিকট কর" এই হাদীস উপস্থাপন করা হয় তখন কিছু লোক বলে, 'এটা ওয়াহাবী হাদীস!' নামাযী যদি নামাযে তার হাত দুটিকে বুকের উপর রাখে অথবা তাশাহহুদে তর্জনী হিলায় -যেমন রসূলুল্লাহ ﷺ করেছেন -তাহলে লোকে তাকে দেখে (নাক সিঁটকে) বলবে, 'এতো ওয়াহাবী!'

সুতরাং 'ওয়াহাবী' সেই তওহীদবাদী মুসলিমের এক প্রতীকরূপে পরিচিত হয়ে পড়েছে, যে কেবলমাত্র তার প্রভু ও প্রতিপালককেই ডাকে এবং তাঁর নবীর সুন্নাহর পূর্ণ অনুসরণ করে। পরন্তু ওয়াহাবী' 'আল-ওয়াহ্হাব' (মহাদাতা)-এর প্রতি সম্বন্ধ; যা আল্লাহর পবিত্র নামাবলীর অন্যতম নাম। যিনি তওহীদবাদীকে তওহীদ দান করেছেন, যা আল্লাহর তরফ হতে তওহীদবাদী-দের জন্য বৃহত্তম অনুগ্রহ ও দান।

৫। তওহীদের দাওয়াত পেশকারীদের জন্য জরুরী, ধৈর্যধারণ করা এবং আল্লাহর রসূলের কথা স্মরণ করে মনকে প্রবোধ দান করা, যাঁকে আল্লাহ বলেছিলেন,

(   )

অর্থাৎ, ওরা যা বলে, তার উপর তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং সৌজন্য সহকারে ওদেরকে উপেক্ষা করে চল। *(সূরা মুয্যাম্মিল ১০ আয়াত)*

( )

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালকের ফায়সালার জন্য ধৈয ধারণ কর এবং ওদের মধ্যে পাপাচারী ও কাফেরদের আনুগত্য করো না। *(সূরা দাহর ২৪ আয়াত)*

৬। সকল মুসলিমের উপর ওয়াজেব, তারা যেন তওহীদের দাওয়াতকে সাদরে গ্রহণ করে এবং তওহীদের প্রতি আহবানকারীকে ভালোবাসে। যেহেতু তওহীদ সাধারণভাবে সমস্ত রসূলগণের এবং (বিশেষভাবে) আমাদের রসূল মুহাম্মাদ ﷺ-এর দাওয়াত। সুতরাং যে ব্যক্তি রসূল ﷺ-কে ভালোবাসে, সে তওহীদের দাওয়াতকে ভালোবাসে এবং যে তওহীদকে ঘৃণা বাসে, সে আসলে রসূল ﷺ-কেও ঘৃণা বাসে।

বিধান ও কর্তৃত্ব একমাত্র আল্লাহ্‌রই

আল্লাহ বিশ্বজগৎ রচনা করেছেন একমাত্র তাঁরই ইবাদত করার জন্য। বিশ্ববাসীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য যুগে যুগে রসূল পাঠিয়েছেন। রসূলের প্রতি ঐশীগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন, যাতে হক ও ন্যায়ের সাথে মানুষের মাঝে বিচার ও ফায়সালা হয়। যে বিচার-সংবিধান আল্লাহর বাণী ও রসূল ﷺ-এর উক্তিরূপে আমাদের নিকট মজুদ রয়েছে; যে বিধান ইবাদত, ব্যবহার, বিশ্বাস, ধর্মনীতি, রাজনীতি ইত্যাদি মানুষের অন্যান্য কর্ম ও বিষয়ে পরিব্যাপ্ত।

১- আকীদাহ্‌ বা বিশ্বাসের বিধান ঃ-

রসূলগণ প্রথম যে বিষয় দ্বারা তাঁদের দাওয়াত আরম্ভ করেন, তা হল আকীদার সংশুদ্ধি এবং তওহীদ (একত্ববাদ)এর প্রতি মানুষকে আহ্বান। সুতরাং ইউসুফ ﷺ কারাগারে তাঁর দুই সঙ্গীকে তওহীদের প্রতি আহবান করলেন; যখন তারা তাদের স্বপ্নবৃত্তান্ত সম্পর্কে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন তখন বৃত্তান্ত বলার পূর্বে তিনি বললেন,

)

(

অর্থাৎ, হে কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না এক পরাক্রমশালী আল্লাহ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা যাদের উপাসনা করছ, তা তো কতকগুলি নাম মাত্র, যা তোমরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখে নিয়েছে, যার কোন প্রমাণ আল্লাহ পাঠান নি। বিধান দেবার অধিকার কেবল আল্লাহরই। তিনি আদেশ দিয়েছেন যে, তিনি ব্যতীত আর কারো তোমরা উপাসনা করো না। এটিই সরল দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এ বিষয়ে অবগত নয়। *(সূরা ইউসুফ ৩৯-৪০ আয়াত)*

২ - ইবাদত সমূহে বিধান ঃ-

নামায, যাকাত, রোযা, হজ্জ প্রভৃতি ইবাদতের যাবতীয় বিধান কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে গ্রহণ করা আমাদের জন্য ওয়াজেব ও জরুরী। যেহেতু নবী ﷺ বলেন, "তোমরা সেই রূপে নামায পড় যে রূপে আমাকে পড়তে দেখেছ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

"তোমরা আমার নিকট হতে হজ্জের বিধান গ্রহণ কর। (শিখে নাও।)" *(মুসলিম)*

আর সকল আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীনগণ বলে গেছেন, 'হাদীস সহীহ হলে সেটাই আমার মযহাব।'

সুতরাং ইমামগণ কোন এক বিষয়ে পরস্পর মতভেদ করলে আমরা কারো উক্তির অন্ধ পক্ষপাতিত্ব করব না। বরং উদারচিত্তে তাঁরই কথা ও মতের পক্ষপাতিত্ব করব যাঁর কথার প্রমাণে কিতাব ও সুন্নাহ হতে সহীহ দলীল দেখব।[7]

---

৭ - প্রকাশ যে, 'চার মযহাবের একটার তকলীদ (অন্ধানুকরণ) করা ওয়াজেব'-কথাটি ভিত্তিহীন। ইমামগণ নিজেরাই এর খন্ডন করে গেছেন। রাহেমাহুমুল্লাহু আজমাঈন। এ বিষয়টি সর্ববাদিসম্মতও নয়। বরং এটা ছিল বিবাদ ও ফিতনা এড়াবার মানসে Principle of excluded middle- এর নীতি। -অনুবাদক।

৩। ক্রয়-বিক্রয়, লেন-দেন, ঋণ ও ভাড়া দেওয়া-নেওয়া প্রভৃতি ব্যবহারিক জীবনের বিধানও একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অধীনে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, না, তোমার প্রতিপালকের শপথ! ওরা মুমিন হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত ওরা ওদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার-ভার তোমার উপর অর্পণ না করে, অতঃপর তোমার বিচারে ওদের মনে কোন দ্বিধা না থাকে এবং সর্বান্তঃকরণে তা মেনে নেয়। *(সূরা নিসা ৬৫ আয়াত)*

ব্যাখ্যাতাগণ এই আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার কারণ উল্লেখ করে বলেন যে, জমির সেচ নিয়ে দুই ব্যক্তি আপোসে কলহ-বিবাদ করে। এদের মধ্যে একজন ছিলেন নবী ﷺ-এর ফুফুতো ভাই যুবাইর। তারা রসূল ﷺ-এর নিকট বিচারপ্রার্থী হলে তাঁর বিচার যুবাইরের অনুকূলে হল। তিনি তাঁকেই তাঁর প্রতিপক্ষের পূর্বে সেচের অধিকার দিলেন। অপর লোকটির প্রতিকূলে বিচার হলে সে তাঁকে বলল, 'ও আপনার ফুফুতো ভাই কিনা, তাই ওর সপক্ষে আপনি বিচার করলেন!' এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে উক্ত আয়াত অবতীর্ণ হল। *(বুখারী)*

৪। দন্ডবিধি ও সমপ্রতিশোধ দন্ডের বিধানও আল্লাহর। তিনি বলেন,

)

(

অর্থাৎ, আর আমি তাদের জন্য ওতে বিধান দিয়েছিলাম যে, প্রাণের বদল প্রাণ, চক্ষুর বদল চক্ষু, নাসিকার বদল নাসিকা, কর্ণের বদল কর্ণ, দন্তের বদল দন্ত এবং জখমের বদল অনুরূপ জখম। অতঃপর কেউ তা ক্ষমা করলে ওতে তারই পাপ মোচন হবে। আর আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই অত্যাচারী। *(সূরা মায়েদাহ ৪৫ আয়াত)*

৫। দ্বীন ও ধর্মনীতির বিধান দেবার সকল অধিকারও আল্লাহর। তিনি বলেন,

( )

অর্থাৎ, তিনি তোমাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছেন এমন দ্বীন যার নির্দেশ দিয়েছিলেন নূহকে এবং যা আমি তোমার প্রতি প্রত্যাদেশ করেছি---। *(সূরা শূরা ১৩ আয়াত)*

মুশরিকরা দ্বীনি-বিধান রচনা করার ক্ষমতা গায়রুল্লাহকে দিয়েছিল, তাই আল্লাহ তাদের প্রতিবাদ করে বলেন,

( )

অর্থাৎ, ওদের কি কতকগুলি অংশীদার (আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্য) আছে যারা ওদের জন্য বিধান দিয়েছে এমন দ্বীনের, যার অনুমতি আল্লাহ দেননি? *(সূরা শূরা ২১ আয়াত)*

সারকথা

সার কথা এই যে, কিতাব ও সহীহ সুন্নাহ দ্বারা জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করা, তদনুসারে জীবন পরিচালনা করা এবং উভয়ের নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়া সমস্ত মুসলিমের জন্য ওয়াজেব। যেহেতু আল্লাহর নির্দেশ,

( )

অর্থাৎ, এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তুমি তদনুযায়ী ওদের মধ্যে বিচার-নিষ্পত্তি কর। *(সূরা মায়েদাহ ৪৯ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "--এবং যতক্ষণ পর্যন্ত তাদের নেতারা (শাসক গোষ্ঠী ও ইমামগণ) আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী বিধান (ও ফায়সালা) না দেয় এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা বরণ না করে, ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ তাদের মাঝে গৃহদ্বন্দ্ব বহাল রাখেন।" *(হাসান, ইবনে মাজাহ প্রভৃতি বর্ণনা করেছেন।)*

মুসলিমদের জন্য এও ওয়াজেব যে, তারা যেন নিজেদের দেশ ও রাষ্ট্র থেকে বিদেশী আইন যেমন ইউরোপীয়, ফরাসী প্রভৃতি কানুন -যা ইসলামী কানুনের পরিপন্থী তা -বাতিল করে এবং সেই সমস্ত বিচারালয়ে বিচারপ্রার্থী না হয় যেখানে ইসলামী আইনের পরিপন্থী আইন দ্বারা বিচার-মীমাংসা করা হয়। বরং আস্থাভাজন উলামাদের নিকট ইসলামী সংবিধানের কাছে নিজেদের বিবাদ-বিসম্বাদের বিচার প্রার্থনা করবে। আর এটাই তাদের জন্য শ্রেয়। কারণ ইসলাম তাদের মাঝে ন্যায্য বিচার করে প্রত্যেকের ন্যায্য প্রাপ্য প্রদান করবে। আর

এতে তাদের বহু অর্থ ও সময় বাঁচবে; যা রাষ্ট্রীয় আদালত সমূহে অনর্থক কোন উল্লেখযোগ্য উপকার ছাড়াই বিনষ্ট হয়ে যায়। এ ছাড়া মানুষের মনগড়া কানূনের নিকট বিচারপ্রার্থী হওয়াতে কিয়ামতে বড় শাস্তি তো আছেই। কারণ তারা আল্লাহর ন্যায়পরায়ণ আইন ও বিচার হতে বৈমুখ্য প্রকাশ করে যালেম সৃষ্টির গড়া আইন ও বিচারের আশ্রয় নেয়।

সর্বাগ্রে আকীদাহ অথবা ইসলামী শাসন?

মক্কা মুকার্রামার দারুল হাদীসে অনুষ্ঠিত এক ভাষণে মহান দ্বীন-প্রচারক মুহাম্মাদ কুতুব উক্ত প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। মূল প্রশ্নটি নিম্নরূপ ঃ-

প্রশ্ন ঃ- কিছু লোক বলে থাকে যে, ইসলামী শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমেই ইসলাম ফিরে আসবে। কিন্তু অন্য কিছু লোক বলে যে, আকীদাহর সংশুদ্ধি এবং সাধারণ তরবিয়তের মাধ্যমেই ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা লাভ সম্ভব হবে। এই দুই অভিমতের কোনটি সঠিক ?

উত্তর ঃ- পৃথিবীর বুকে এই দ্বীনের শাসন-ব্যবস্থা কোথা হতে আসবে -যদি দাওয়াতপেশকারীরা আকীদাহর পরিশুদ্ধি সাধন না করে ও লোকেরা সঠিক ঈমানের মু'মিন না হয়; যারা তাদের দ্বীনে ক্লিষ্ট হলে ধৈর্য ধারণ করবে এবং আল্লাহর পথে জিহাদ করবে? এরূপ হলে তবেই পৃথিবীতে আল্লাহর দ্বীন (ইসলামী শাসন) প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এতো খুব স্পষ্ট ব্যাপার। শাসক তো আর আকাশ হতে আসবে না, আকাশ হতে অবতীর্ণ হবে না। অবশ্য প্রত্যেক বস্তু তো আসমান (আল্লাহর তরফ) হতেই আসে। কিন্তু তা মানুষের তদবীর ও প্রচেষ্টায়; যা আল্লাহ মানবজাতির উপর ফরয করেছেন। তিনি বলেন,

( )

অর্থাৎ, আল্লাহ ইচ্ছা করলে (শাস্তি দিয়ে বা ধ্বংস করে) ওদের নিকট হতে প্রতিশোধ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু (যুদ্ধের বিধান দিয়ে) তিনি একেকে অপরের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। *(সূরা মুহাম্মদ ৪ আয়াত)*

সুতরাং আকীদার পরিশুদ্ধি এবং বিশুদ্ধ আকীদার উপর জনগোষ্ঠীর তরবিয়ত ও প্রশিক্ষণ সর্বাগ্রে শুরু করা আমাদের জন্য জরুরী। যাতে এমন জনগণ তৈরী হয় যারা নিপীড়িত ও বিপদগ্রস্ত হলে অকাতরে সহিষ্ণুতার পরিচয় দেবে যেমন আমাদের প্রথম (পূর্ব)পুরুষ (সাহাবাগণ) সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে গেছেন।

শির্কে আকবর ও তার প্রকারভেদ

শির্ক আকবর (বড় শির্ক) তখন হবে যখন আপনি কাউকে আল্লাহর সমতুল্য বা সমকক্ষ (শরীক) স্থাপন করবেন। তাকে আপনি ডাকবেন; যেমন আল্লাহকে ডাকেন অথবা কোন প্রকার ইবাদত -যেমন বিপদে সাহায্য প্রার্থনা, যবেহ, নযর-নিয়াজ প্রভৃতি তার জন্য নিবেদন করবেন।

বুখারী ও মুসলিম শরীফে ইবনে মসঊদ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'কোন পাপ সর্বপেক্ষা বড়?' উত্তরে তিনি বললেন, "তোমার আল্লাহর সমকক্ষ স্থাপন করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।" (সমকক্ষ অর্থাৎ সমতুল্য ও অংশীদার)।

শির্কে আকবরের প্রকারভেদ

১। দুআয় (প্রার্থনা ও ডাকার) শির্ক ঃ- রুজী অনুসন্ধান, রোগ নিরাময় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে আম্বিয়া, আওলিয়া ইত্যাদি গায়রুল্লাহকে ডাকলে বা প্রার্থনা করলে এই শির্ক হয়। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে আহবান করো না যে তোমার কোন উপকার করে না এবং অপকারও করে না। যদি তা কর, তাহলে তুমি যালেম (মুশরিক)দের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(সূরা ইউনুস ১০৬ আয়াত)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে কোন শরীক (উপাস্য) কে ডাকা অবস্থায় মারা যায় সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।" *(বুখারী)*

আল্লাহ ব্যতীত মৃত বা জীবিতদেরকে (বিপদে) ডাকা বা তাদের নিকট কিছু প্রার্থনা করা (যা তাদের দেবার সাধ্য নেই) শির্ক। এ কথার দলীল আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

)

(

অর্থাৎ, এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারা অতি তুচ্ছ (খেজুরের আঁটির উপর পাতলা আবরণেরও) মালিক নয়। তোমরা তাদেরকে আহবান করলে তোমাদের আহবান তারা শুনবে না, আর শুনলেও তোমাদেরকে সাড়া দেবে না। (তোমাদেরকে কিছুও দান করতে পারে না) কিয়ামতের দিন তোমাদের ঐ শির্ককে তারা অস্বীকার করবে। সর্বজ্ঞ (আল্লাহর) ন্যায় তোমাকে কেউই অবহিত করতে পারবে না। *(সূরা ফাত্বির ১৩-১৪ আয়াত)*

২। আল্লাহর গুণাবলীতে শির্ক ঃ-

যেমন এই বিশ্বাস যে, আম্বিয়া ও আওলিয়াগণ গায়েব (অদৃশ্যের খবর) জানেন। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ ঃ- তাঁর নিকটেই গায়েবের চাবি। তিনি ব্যতীত তা আর কেউ জানে না। *(সূরা আনআম ৫৯ আয়াত)*

৩। মহব্বতের শির্ক ঃ-

তা হল, আওলিয়া প্রভৃতিকে এমন ভালোবাসা ও ভক্তি করা যেমন আল্লাহকে ভালোবাসা ও ভক্তি করা হয়। এর দলীল আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

)

(

অর্থাৎ, কিছু লোক আছে যারা আল্লাহর পরিবতে´ (তাঁর) বিভিন্ন সমকক্ষ স্থির করে তাদেরকে এমন ভালোবাসে; যেমন আল্লাহকে বাসা হয়। কিন্তু যারা ঈমান এনেছে তারা আল্লাহর ভালোবাসায় সুদৃঢ়। *(সূরা বাক্বারাহ ১৬৫ আয়াত)*

৪। আনুগত্যের শির্ক ঃ-

তা হল বৈধ মনে করে আল্লাহর অবাধ্যাচরণে (নাফরমানী করে) উলামা (ইমাম) ও পীর-বুযুর্গদের আনুগত্য করা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহর পরিবর্তে ওদের পন্ডিত (পাদরী) ও সংসার বিরাগী-দেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। *(সূরা তাওবাহ ৩১ আয়াত)*

ওরা ওদের এক প্রকার উপাসনা করত। যে উপাসনার ব্যাখ্যা হল, আল্লাহ যা হারাম করেছেন তা হালাল করে এবং তিনি যা হালাল করেছেন তা হারাম করে পাপ কাজে তাদের আনুগত্য করা।

মহানবী ﷺ বলেন, “স্রষ্টার অবাধ্যাচরণ করে কোন সৃষ্টির আনুগত্য নেই।” *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

৫- সর্বেশ্বরবাদের শির্ক ঃ-

অর্থাৎ এই বিশ্বাস যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিতে আবির্ভূত। এই বিশ্বাস দেমাস্কে সমাধিস্থ সূফী ইবনে আরাবীর। এমনকি সে বলেছে,

‘প্রভু তো দাস, আর দাস হল প্রভু,
হায় যদি আমি জানতে পারতাম, ‘মুকাল্লাফ’
(শরীয়তের আজ্ঞাপ্রাপ্ত) কে ?!’

সর্বেশ্বরবাদে বিশ্বাসী ভিন্ন এক সূফী কবি বলেছে,

‘কুকুর-শুকরও আমাদের উপাস্যই,

আল্লাহ তো গীর্জায় অবস্থানকারী পাদরীও!'([৮])

৬ - নিয়ন্ত্রণকর্মের শির্ক ঃ-

এই বিশ্বাস যে, কিছু আওলিয়ার বিশ্ব-নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা আছে, যাঁরা বিশ্বকর্ম পরিচালনা করে থাকেন! যাঁদেরকে 'কুতুব' বলা হয়।

অথচ আল্লাহ তাআলা প্রাচীন মুশরিকদেরকে এই বলে প্রশ্ন করেন,

( )

অর্থাৎ,'---এবং কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে?' তখন তারা বলবে, 'আল্লাহ।' *(সূরা ইউনুস ৩১আয়াত)*

৭ - ভয়ের শির্ক ঃ-

এই বিশ্বাস যে, কিছু মৃত অথবা অনুপস্থিত আওলিয়ার প্রভাব ও অনিষ্ট করার ক্ষমতা আছে যা ঐ বিশ্বাসীর মনে ভয় সঞ্চার করে ফলে ওদেরকে ভয় করে। এই বিশ্বাস ছিল মুশরিকদের। এর প্রতি সতর্ক করে কুরআন বলে,

( )

অর্থাৎ, আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন? অথচ তারা তোমাদেরকে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যের ভয় দেখায়। *(সূরা যুমার ৩৬ আয়াত)*

অবশ্য হিংস্র জন্তু এবং জীবিত কোন অত্যাচারী ব্যক্তি হতে প্রকৃতিগত ভয় শির্কের পর্যায়ভুক্ত নয়।

৮ - বিধান রচনার শির্ক ঃ-

---

(৮) এই মতবাদে বিশ্বাসী জনৈক কবি এক জলাশয়ের প্রান্তে বসে থেকে দেখল যে,পদ্মপাতার উপর একটি ব্যাঙ বসে আছে। ইতিমধ্যে একটি সাপ তাকে আক্রমণ করতে চাইলে সে পানির মধ্যে লুকিয়ে পড়ে। এ দৃশ্য দেখে সে গায়,

'হরির উপরে হরি হরি শোভা পায়,
হরিকে দেখিয়া হরি হরিতে লুকায়!' -অনুবাদক

যে ব্যক্তি ইসলাম-পরিপন্থী বিধান প্রণয়ন ও প্রচলন করে মানুষের মনগড়া কানুনকে মানা বৈধ মনে করে অথবা ইসলামী সংবিধানকে অচল ভাবে তার এই শির্ক হয়। এতে শাসক ও শাসনাধীন ব্যক্তি এবং বিচারক ও বিচারাধীন ব্যক্তি সকলেই এই শির্কের পর্যায়ভুক্ত হবে; যদি বিচারাধীন ব্যক্তি ঐ কানুনে বিশ্বাসী ও ঐ বিচারে সন্তুষ্ট হয় তবে।

৯ - শির্কে আকবর আমল বিধ্বংস করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমার প্রতি এবং তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়েছে যে, যদি তুমি শির্ক কর তাহলে নিশ্চয় তোমার আমল (সৎকর্ম) নিষ্ফল হয়ে যাবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(সূরা যুমার ৬৫ আয়াত)*

১০। সম্পূর্ণরূপে শির্ক ত্যাগ করে তওবা না করা পর্যন্ত আল্লাহ শির্কে আকবরের পাপ ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেন,

)

(

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সহিত শির্ক করার পাপ ক্ষমা করেন না, এ ছাড়া অন্যান্য পাপ যার জন্য ইচ্ছা তিনি ক্ষমা করে দেন। আর যে আল্লাহর সহিত শির্ক করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। *(সূরা নিসা ১১৬ আয়াত)*

১১। শির্ক বহু প্রকারের। যার কিছু শির্কে আকবর এবং কিছু আসগর; যা থেকে সতর্ক থাকা ওয়াজেব। রসূল ﷺ আমাদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা যেন এই দুআ করি,

( )

উচ্চারণ ঃ- আল্লাহুম্মা ইন্না নাউযু বিকা মিন আন নুশরিকা বিকা শাইআন না'লামুহ, অনাস্তাগ্‌ফিরুকা লিমা লা না'লাম।

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমরা তোমার সহিত আমাদের কোন জানা বিষয়ে শরীক করা হতে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং অজানা

বিষয়ে শির্কের পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করছি। *(ইমাম আহমাদ হাদীসটিকে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।)*

গায়রুল্লাহকে আহবানকারীর উপমা

আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, হে মানুষ! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, তোমরা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর ঃ তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, তারা তো কক্ষনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবে না -যদিও তারা এ উদ্দেশ্যে সকলে একত্রিত হয়। আবার মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু নিয়ে চলে যায়, তবে তাও তারা তার নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবে না। প্রার্থী ও প্রার্থিত উভয়ই অক্ষম। *(সূরা হজ্জ৭৩ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা মানবজাতিকে সম্বোধন করে মহান উপমাটি মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করতে আদেশ করেন। তিনি বলেন, ঐ আওলিয়া, সালেহীন প্রভৃতিগণ; যাদেরকে তোমরা বিপদে সাহায্য লাভের জন্য আহবান করছ তারা তোমাদের সাহায্য করতে অক্ষম। বরং তারা কোনও এক সৃষ্টি যেমন একটি মাছিও সৃজন করতে অসমর্থ। আবার মাছি যদি তাদের খাদ্য অথবা পানীয়র কিছু অংশ নিয়ে চলে যেতে চায়, তবে তাও ফিরিয়ে আনতে তারা সক্ষম হবে না। এ তাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার এবং মাছিরও হীনতা ও

ক্ষীণতার দলীল। সুতরাং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা তাদেরকে কি ভেবে আহবান করছ ?

অত্র উপমায় তাদের বিরুদ্ধে ঘোর প্রতিবাদ জানানো হয়েছে যারা আম্বিয়া, আওলিয়া প্রভৃতি গায়রুল্লাহকে বিপদে ডেকে থাকে।

২। আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, সত্য আহবান তাঁরই। যারা তাঁকে ব্যতীত অন্যকে আহবান করে ওরা তাদেরকে কোন সাড়াই দেয় না, তাদের দৃষ্টান্ত সেই (পিপাসার্ত) ব্যক্তির মত, যে তার মুখে পানি পৌঁছবে এই আশায় তার হস্তদ্বয় এমন পানির দিকে প্রসারিত করে যা তার মুখে পৌঁছবার নয়। কাফেরদের আহবান তো নিষ্ফল। *(সূরা রা'দ ১৪ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে এ কথাই বুঝানো হয়েছে যে, দুআ (আহবান ও প্রার্থনা), যা মূল ইবাদত তা একমাত্র আল্লাহরই জন্য নিবেদিত হওয়া উচিত। ওরা যে আল্লাহকে ছেড়ে অপরকে আহবান করছে তাতে ওরা ওদের নিকট কোন উপকার লাভ করবে না। আর ওরাও (গায়রুল্লাহ) ওদেরকে কোন প্রকার সাড়াও দেবে না, কোন সাহায্যও করতে পারবে না। তাদের উপমা সেই তৃষ্ণার্ত ব্যক্তির ন্যায়, যে এক কুঁয়ার উপর দন্ডায়মান থেকে হাত বাড়িয়ে পানি নিয়ে মুখে দেওয়ার অপচেষ্টা করে ; যা তার সাধ্যে নয়। (যেহেতু সে পানি তার নাগালের বাইরে।)

মুজাহিদ বলেন, 'সে নিজের জিহ্বা দ্বারা পানিকে ডাকে এবং ইশারা করে কিন্তু পানি কক্ষনোই মুখে এসে পৌঁছে না।' *(ইবনে কাসীর)*

অতঃপর যারা আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে ডাকে তাদের সম্পর্কে তিনি ফায়সালা দেন যে, তারা কাফের এবং তাদের ঐ আহবান ভ্রষ্টতা ও নিষ্ফল। যেহেতু তিনি বলেন, 'কাফেরদের আহবান তো নিষ্ফল।'

অতএব ভাই মুসলিম! গায়রুল্লাহকে ডেকে কাফের ও ভ্রষ্ট হয়ে যাওয়া থেকে সাবধান হন। আর একমাত্র সর্বশক্তিমান আল্লাহকেই ডাকুন। এতে আপনি তওহীদবাদী মুমেনদের অন্তর্ভুক্ত হবেন।

শির্ক দূরীকরণের উপায়

তিন প্রকার শির্ক দূর না করে আল্লাহর সহিত শির্ক দূর করা সম্পন্ন ও সম্ভব হবে না ঃ-

১। প্রতিপালকের কর্মসমূহে শির্ক ঃ-

এই বিশ্বাস যে, আল্লাহর সহায়ক কোন ভিন্ন সৃষ্টিকর্তা অথবা নিয়ন্তা আছে। যেমন কিছু সূফীপন্থী মনে করে যে, আল্লাহ তাআলা কিছু বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ-ভার তাঁর কিছু আওলিয়া ও কুতুবকে সমর্পণ করেছেন! যে বিশ্বাসের বিশ্বাসী প্রাক্ ইসলাম যুগের মুশরিকরাও ছিল না। তাই তাদেরকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করলেও তারা ওদের মত উত্তর দেয়নি। আল্লাহ বলেন,

( )

অর্থাৎ, 'কে সকল বিষয় নিয়ন্ত্রণ করে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ।' *(সূরা ইউনুস ৩১ আয়াত)*

এক সূফী লেখকের বই 'আলকা-ফী ফির্রদ্দি আলাল্ অহ্হা-বী'তে পড়েছি, লেখক বলেন, 'আল্লাহর এমন অনেক বান্দা আছে যারা কোন কিছুর উদ্দেশ্যে 'হও' বললে সাথে সাথে তা হয়ে যায়!'

অথচ কুরআন তার এই কথার মিথ্যায়ন ও খন্ডন করে। আল্লাহ বলেন,

( )

অর্থাৎ, তিনি যখন কিছু করতে ইচ্ছা করেন, তখন (তার প্রতি ইঙ্গিত করে) কেবল 'হও' বললে তা হয়ে যায়। *(সূরা ইয়াসীন ৮২ আয়াত)*

অন্যত্রে তিনি বলেন, ( )

অর্থাৎ জেনে রাখ, সৃষ্টি করা ও নির্দেশ দান কেবল তাঁরই কাজ। *(সূরা আ'রাফ ৫৪ আয়াত)*

২। ইবাদত ও দুআতে শির্ক ঃ-

আল্লাহর ইবাদত করা ও তাঁকে ডাকার সাথে সাথে অন্যান্য আম্বিয়া আওলিয়া ও সালেহীনদেরকেও ডাকা। যেমন তাঁদের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করা বিপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে তাদেরকে আহবান করা। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় যে, এই শির্ক বর্তমান উম্মাহর মাঝে বহুল প্রচলিত। এই মহাপাপের অধিকাংশ বহন করবেন সেই পীর বুযুর্গ ও আলেমরা যাঁরা অসীলার নামে এই ধরনের শির্ককে সমর্থন করে থাকেন এবং তাকে ভিন্ন নামে অভিহিত করে থাকেন। যেহেতু অসীলা মানা হল কাউকে মাধ্যম করে আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করা। কিন্তু ওরা যা করে থাকে তা তো সরাসরি গায়রুল্লাহর নিকটেই প্রার্থনা করা। যেমন ওরা বলে, 'মদদ ইয়া রাসূলাল্লাহ!' 'মদদ ইয়া জীলানী!' অথবা 'মদদ ইয়া বদবী!' (মদদ ইয়া খাজা! মদদ ইয়া আলী!) আর এই যাচনাই হল গায়রুল্লাহর উপাসনা। যেহেতু তা দুআ ও ফরিয়াদ। আর নবী ﷺ বলেন, "দুআই তো ইবাদত (উপাসনা)।" *(তিরমিযী, এবং তিনি হাদীসটিকে হাসান বলেছেন।)*

পক্ষান্তরে মদদ আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট চাওয়া বৈধ নয়। তিনি বলেন, ( )

অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি দ্বারা মদদ (সমৃদ্ধ) করবেন। *(সূরা নূহ ১২ আয়াত)*

৩। শাসন ও বিচারের শির্কও ইবাদতের শির্কের পর্যায়ভুক্ত যদি শাসক বা বিচারক অথবা শাসনাধীন বা বিচারাধীন ব্যক্তি আল্লাহর বিধান ও কানুনকে অচল মনে করে অথবা তাঁর বিধান ও কানুন ব্যতীত অন্য বিধান ও কানুন অনুযায়ী শাসন ও বিচার বৈধ মনে করে।

৪। আল্লাহর গুণাবলীতে শির্ক ঃ-

আল্লাহর কোন কোন সৃষ্টি যেমন আম্বিয়া, আওলিয়া প্রভৃতিকে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার বিশিষ্ট কোন কোন গুণ দ্বারা গুণান্বিত করা। যেমন উদাহরণ স্বরূপ, গায়েবী খবর জানা।

এই প্রকার শির্ক সূফীপন্থী এবং এদের দ্বারা প্রভাবান্বিত লোকদের মাঝে ব্যাপক প্রচলিত। যেমন বূসীরী নবী ﷺ-এর প্রশংসা করে বলেছে,

'হে নবী পৃথিবী ও তার অফুরন্ত সম্পদ তোমার বদান্যতারই অংশ,
লওহে মাহফূয ও কলমের ইলমও তোমার অগাধ ইলমের অন্তর্ভুক্ত!!'

এখান হতেই কিছু ধর্মধ্বজী দাজ্জালদের ভ্রষ্টতার প্রাদুর্ভাব ঘটে। যারা ধারণা করে যে, তারা রসূল ﷺ-কে জাগ্রতাবস্থায় দেখে থাকে এবং তাদের সহচরবর্গকে তাদের কোন কোন বিষয়ে দায়িত্বভার দেবার পূর্বে তাঁকে ওদের অন্তস্তলের গুপ্ত রহস্য প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করে। অথচ রসূল ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় এ ধরনের রহস্য জানতে পারতেন না। যেমন তাঁর তরফ থেকে কুরআন বলে,

( )

অর্থাৎ, আমি যদি গায়েব (অদৃশ্যের খবর) জানতাম, তবে তো আমি প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং অকল্যাণ আমাকে স্পর্শই করত না। *(সূরা আ'রাফ ১৮৮)*

সুতরাং ইহকাল ত্যাগ করার পর এবং সুমহান বন্ধুর নিকট চলে যাওয়ার পর তিনি গায়েবের খবর কি রূপে জানতে পারেন?

তিনি এক বালিকাকে যখন কবিতায় বলতে শুনলেন, "আমাদের মাঝে এমন নবী আছেন; যিনি আগামীকালের অবস্থা জানেন।" তখন তিনি বললেন, "এই কথাটি ছেড়ে দাও (বলো না) বাকী যেগুলি বলছিলে সেগুলি বল।" *(বুখারী)*

অবশ্য আল্লাহ তাআলা তাঁর রসূলগণকে কোন কোন গায়েবী বিষয়ে অবহিত করে থাকেন। যেমন তিনি বলেন,

( )

অর্থাৎ, তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা, তিনি তাঁর অদৃশ্যের (গায়েবী) জ্ঞান কারো নিকট প্রকাশ করেন না- তাঁর মনোনীত রসূল ব্যতীত। *(সূরা জিন ২৬-২৭ আয়াত)*

তওহীদবাদী কে ?

উক্ত তিন প্রকার শির্ক থেকে আল্লাহকে যে পবিত্র করবে এবং তাঁর সত্তা, ইবাদত, দুআ, এবং গুণাবলীতে তাঁকে একক ও অদ্বিতীয় মানবে সেই হল তওহীদবাদী। তার জন্য রয়েছে তওহীদবাদীদের মত বিশিষ্ট মর্যাদা। আর যে ব্যক্তি ঐ তিন প্রকার শির্কের কোন এক প্রকার আল্লাহর জন্য স্থাপন করবে সে তওহীবাদী হবে না। বরং তার পক্ষে আল্লাহ তাআলার এই বাণী সঙ্গত হবে। তিনি বলেন,

( )

অর্থাৎ, ওরা যদি শির্ক করত তাহলে ওদের সমস্ত কৃতকর্ম পণ্ড হয়ে যেত। *(সূরা আনআম ৮৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

( )

অর্থাৎ, তুমি যদি শির্ক কর তবে তোমার আমল নিষ্ফল হবে এবং তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। *(সূরা যুমার/৬৫ আয়াত)*

কিন্তু যদি সে তওবা করে আল্লাহকে শরীক থেকে পবিত্র করে, তাহলে সে তওহীদবাদীদের অন্তর্ভুক্ত হবে।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে তওহীদবাদীদের শ্রেণীভুক্ত কর এবং মুশরিক (অংশীবাদী)দের দলভুক্ত করো না।

শির্ক আসগর ও তার প্রকারভেদ

প্রত্যেক সেই মাধ্যম ও উপায় (কর্ম) যা শির্কে আকবরের কাছে পৌঁছে দেয় আর যা ইবাদতের মর্যাদায় না পৌঁছে তা শির্কে আসগর (ছোট শির্ক)। এ ধরনের শির্ককারী ইসলাম হতে বহির্ভূত হয়ে যায় না। তবে তা কাবীরাহ গোনাহ (মহাপাপ) অবশ্যই বটে। যেমন ঃ-

১। কিঞ্চিৎ রিয়া (লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা) ও সৃষ্টির দৃষ্টি ও মন আকর্ষণের উদ্দেশ্যে ইবাদতকে সুশোভিত করা। যেমন এক মুসলিম

আল্লাহর উদ্দেশ্যে সৎকর্ম করে, আল্লাহর জন্য নামায পড়ে। কিন্তু লোকের সামনে তাদের প্রশংসা লুটার উদ্দেশ্যে তার সৎকর্ম ও নামাযকে সুন্দররূপে সুশোভিত করে - এরূপ কর্ম ছোট শির্ক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রভুর ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। *(সূরা কাহ্ফ ১১০ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি তোমাদের জন্য যা অধিক ভয় করি, তা হল ছোট শির্ক; রিয়া। আল্লাহ কিয়ামতে যখন সকল মানুষকে তাঁদের নিজ নিজ আমলের প্রতিদান দেবেন তখন তিনি বলবেন, 'তাদের নিকট যাও যাদেরকে প্রদর্শন করে তোমরা কর্ম করতে অতঃপর দেখ, তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কি না!' *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

২। আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নামে কসম (শপথ, হলফ বা কিরে) করা। নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি গায়রুল্লাহর নামে কসম করে সে শির্ক করে।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

আবার গায়রুল্লাহর নামে শপথ করা শির্কে আকবরও হতে পারে যদি শপথকারী এই বিশ্বাস রাখে যে, ওলী (বা যাঁর নামে শপথ করেছে তাঁর) এমন ইচ্ছাশক্তি আছে যে, তাঁর নামে মিথ্যা শপথ করলে তিনি তার ক্ষতি করবেন।

৩। শির্ক খাফী (অস্পষ্ট বা গুপ্ত শির্ক) আর তা ইবনে আব্বাসের ব্যাখ্যানুযায়ী কোন ব্যক্তির তার সঙ্গীকে 'আল্লাহ ও আপনি যা চেয়েছেন (তাই হয়েছে)' বলা।

তদনুরূপ 'যদি আল্লাহ এবং অমুক না থাকত (তাহলে আমার এই হত)' বলা। অবশ্য 'যদি আল্লাহ তারপর অমুক না থাকত (তাহলে আমার এই হত)' বলা বৈধ।

রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা 'আল্লাহ এবং অমুক যা চেয়েছে' বলো না বরং 'আল্লাহ তারপর অমুক যা চেয়েছে' বল।" *(সহীহ মুসনাদে আহমদ প্রভৃতি)*

কিছু প্রচলিত শির্ক

বর্তমানে মুসলিম-বিশ্বে ব্যাপক আকারে প্রচলিত শির্কের সমারোহই মুসলিমদের দুর্দশা এবং ফিতনা ফাসাদ, ভূমিকম্প, যুদ্ধ প্রভৃতি আযাবে নিষ্পেষিত হওয়ার প্রধান কারণ। যা তাদের তওহীদ হতে বিমুখ এবং তাদের বিশ্বাস ও আচরণে শির্ক বহিঃপ্রকাশ হওয়ার কারণে আল্লাহ তাআলা তাদের উপর অবতীর্ণ করেছেন। অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে নানা প্রকার শির্কের ঘটা দেখা যায় -যাকে বহু মুসলিম ইসলাম (বা ধর্ম) বলে মনে করে তা উক্ত কথারই প্রমাণ। আর তা ধর্ম মনে করে বলেই তারা তাকে মন্দ জানে না। অথচ তারা জানে যে, শির্কী রীতি ও কর্মকে এবং শির্কের যাবতীয় অসীলা ও উপকরণকে নিশ্চিহ্ন করার জন্যই ইসলামের আবির্ভাব।

প্রধান প্রধান প্রচলিত শির্ক যেমন ঃ-

১। গায়রুল্লাহকে ডাকা (তাদের নিকট কিছু চাওয়া)। এই শির্কের বহিঃপ্রকাশ সাধারণতঃ অধিকাংশ না'ত, গজল-গীতি ও কাওয়ালী প্রভৃতিতে ঘটে থাকে; যা নবী দিবস, উরস এবং ঐতিহাসিক কোন স্মরণীয় দিবস উপলক্ষে আবৃত্তি করা ও গাওয়া হয়। আমি স্বয়ং ওদেরকে গাইতে শুনেছি,

'হে রসূলদের ইমাম, হে আমার অবলম্বন!
আপনি আল্লাহর দরজা ও আমার ভরসাস্থল।
আমার ইহকালে ও আমার পরকালে-
হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার হাত ধরুন।
আমার কষ্টকে স্বস্তিতে আপনি ব্যতীত-
আর কেউ পরিণত করতে পারে না, হে সম্মানের মুকুট!'

এ ধরনের স্তুতিবাদ যদি রসূলও শুনতেন তবে নিশ্চয় তিনি এতে অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতেন। যেহেতু একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত কষ্টকে স্বস্তিতে পরিণত করতে (মুশকিল আসান করতে) কেউই পারে না।

তদনুরূপ সেই সমস্ত গজল ও কবিতা যা পত্র-পত্রিকা ও বই-পুস্তকে লিখা হয়, যাতে রসূল আওলিয়া এবং সালেহীনদের নিকট মদদ, সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করা হয় যা মঞ্জুর করতে তাঁরা সক্ষম নন।

২। আওলিয়া ও সালেহীনদেরকে মসজিদে দাফন (সমাধিস্থ) করা। সুতরাং অধিকাংশ মুসলিম দেশে আপনি প্রায় মসজিদে কবর দেখতে পাবেন, যার কিছুর উপরে কুব্বা, গম্বুজ বা মাযারও নির্মিত আছে। কিছু লোক আল্লাহকে ছেড়ে সে সমস্ত কবরের কাছে নিজেদের প্রয়োজন ভিক্ষা করে। অথচ রসূল ﷺ কবরকে মসজিদ বানাতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন, “আল্লাহ ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে অভিসম্পাত করুন; তারা তাদের আম্বিয়াদের কবরসমূহকে মসজিদ বানিয়ে নিয়েছে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

অতএব আম্বিয়াগণকে যদি মসজিদে দাফন করা অবিধেয় হয় তাহলে কোন পীর বা আলেমকে তাতে দাফন করা কি করে বৈধ হতে পারে? পরন্তু বিদিত যে, ঐ সমাধিস্থ ব্যক্তিকে আল্লাহর পরিবর্তে ডাকাও হতে পারে। যা শির্ক সংঘটনের কারণ হয়ে বসবে। অথচ ইসলাম শির্ক এবং তার দিকে পৌঁছে দেয় এমন সমস্ত উপায়-উপকরণকে হারাম ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করে।

৩। আওলিয়াদের নামে নযর মানা। কিছু লোক আছে, যারা অমুক অলীর নামে কোন পশু (মুরগী, খাসি বা শিরনী মিঠাই) ইত্যাদির নযর (মানত বা মানসিক) মেনে থাকে। অথচ এইরূপ নযর মানা শির্ক; যা পুরণ করা হারাম। যেহেতু নযর মানা এক ইবাদত। যা একমাত্র আল্লাহর জন্য ও উদ্দেশ্যে নিবেদিত হয়। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, তারা তাদের নযর পূর্ণ করে এবং সেদিনকে ভয় করে যেদিনের ধ্বংসলীলা হবে ব্যাপক। *(সূরা দাহর ৭ আয়াত)*

৪। আম্বিয়া ও আওলিয়াদের কবর সমীপে পশু যবেহ করা যদিও নিয়ত আল্লাহর নামে ও উদ্দেশ্যেই যবেহ করা হয়। যেহেতু উক্ত কর্ম মুশরিকদের; যারা তাদের আওলিয়ারূপী মূর্তিসমূহের সন্নিকটে পশু যবেহ (বলিদান) করত।

রসূল ﷺ বলেন, “আল্লাহ তাকে অভিশাপ করেন, যে গায়রুল্লাহর উদ্দেশ্যে যবেহ করে।” *(মুসলিম)*

৫। আম্বিয়া এবং আওলিয়া যেমন; জীলানী, রিফায়ী, বদবী, হুসাইন (নিযামুদ্দীন, মুঈনুদ্দীন চিশতী, শাহ জালাল, খান জাহান, দাতা সাহেব) বা

অন্য কারো কবরের তওয়াফ করা। যেহেতু তওয়াফ করা এক ইবাদত। যা একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে কা'বা শরীফকে কেন্দ্র করেই করা বিধেয়। আল্লাহ তাআলা বলেন, ( )

অর্থাৎ, এবং তারা যেন প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে।" *(সূরা হজ্জ ২৯ আয়াত)*

৬। কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়া। এরূপ অবৈধ। মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা কবরের উপর বসো না এবং তার প্রতি সম্মুখ করে নামায পড়ো না।"

৭। কবর দ্বারা বর্কত অর্জনের (তাবার্রুকের) উদ্দেশ্যে অথবা তার নিকট নামায পড়ার উদ্দেশ্যে সফর (তীর্থযাত্রা) করা। এটাও বৈধ নয়। যেহেতু নবী ﷺ বলেন, "তিন মসজিদ ব্যতীত অন্য কোন স্থানের প্রতি সফর করা হবে না; মসজিদে হারাম, আমার এই মসজিদ (নববী) এবং মসজিদে আকসা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সুতরাং আমরা মদীনা নববিয়্যা যাবার ইচ্ছা করলে বলব, 'মসজিদে নববীর যিয়ারত ও নবী ﷺ -এর প্রতি সালাম পড়তে মদীনা যাব।'

৮। আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানের পরিবর্তে অন্য বিধান দ্বারা জীবনও রাষ্ট্র পরিচালনা এবং বিচার-আচার করা। যেমন মানুষের মনগড়া কানুন দ্বারা বিচার করা যা কুরআন কারীম এবং সহীহ সুন্নাহর পরিপন্থী। যদি ঐ সমস্ত কানুন মান্য ও কার্যকর করা বৈধ মনে করে (তবে তা এক প্রকার কুফরী)।

তদনুরূপ সেই সমস্ত ফতোয়া যা কিছু উলামা প্রকাশ করে থাকেন অথচ তা ইসলামের স্পষ্ট উক্তির পরিপন্থী। যেমন (ইচ্ছাকৃত কোন ব্যাখ্যা না থাকা সত্ত্বেও) সুদ হালালের ফতোয়া। অথচ আল্লাহ সুদখোরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন!

৯। কুরআন অথবা সহীহ সুন্নাহর স্পষ্ট উক্তির পরিপন্থী বিষয়ে শাসক, রাষ্ট্রনেতা উলামা ও বুযুর্গদের আনুগত্য। যাকে 'শির্কুত্-ত্বাআহ' (আনুগত্যের শির্ক) বলা হয়। (৯) নবী ﷺ বলেন, "স্রষ্টার অবাধ্যতা করে কোন সৃষ্টির জন্য আনুগত্য নেই।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

---

(৯) যদি অনুগত ব্যক্তি অবাধ্যতা ও পাপে তাদের আনুগত্য করার বৈধতার বিশ্বাসী হয়।

আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, ওরা ওদের পন্ডিতগণকে, সংসারবিরাগীদেরকে এবং মারয়্যাম তনয় মাসীহকেও আল্লাহর পরিবর্তে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে। অথচ ওরা কেবল একই উপাস্যের উপাসনা করতে আদিষ্ট হয়েছিল। তিনি ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই। ওদের শির্ক হতে তিনি পবিত্র। *(সূরা তাওবাহ ৩১ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে ইবাদত (উপাসনা)র ব্যাখ্যায় হুযাইফাহ বলেন, "তা হল ইয়াহুদদের উলামারা যা তাদের জন্য হালাল করেছে অথবা হারাম করেছে তাতে ওদের আনুগত্য করা।

দর্গা ও মাযার

বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে -যেমন, সিরিয়া, ইরাক, মিসর প্রভৃতি দেশে যে সব দর্গা আমরা দেখতে পাই তা ইসলামী শিক্ষা ও নির্দেশের পরিপন্থী। যেহেতু নবী ﷺ কবরের উপর ইমারত নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন। সহীহ হাদীসে বর্ণিত, "রসূল ﷺ কবর চুনকাম করা, তার উপর বসা এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করা হতে নিষেধ করেছেন।" *(মুসলিম)*

যে কোন প্রকার রং দ্বারা রঞ্জিত করা চুনকামের পর্যায়ভুক্ত।

তিরমিযীর এক সহীহ বর্ণনায় আরো বলা হয়েছে যে, "এবং কবরের উপর (কুরআনের আয়াত, কবিতা ইত্যাদি) লিখা হতেও তিনি নিষেধ করেছেন।"

১। এই মাযারসমূহের বেশীর ভাগই ঝুটা ও অলীক। সুতরাং হুসাইন বিন আলী رضي الله عنه ইরাকে শহীদ হন। তিনি (বা তাঁর শবদেহ) মিসর পৌঁছেননি। অতএব মিসরে তাঁর কবর সত্য নয়। আর একথার বড় দলীল এই যে, ইরাক, মিসর ও সিরিয়ায় তাঁর কবর বর্তমান! এবং দ্বিতীয় দলীল এই যে, সাহাবাগণ মসজিদে কোন মৃত সমাধিস্থ করতেন না। কারণ রসূল ﷺ বলেন,"আল্লাহ

ইয়াহুদকে ধ্বংস করুন, তারা তাদের আম্বিয়াগণের কবর সমূহকে মসজিদরূপে গ্রহণ করেছে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

আর এর পশ্চাতে হিকমত ও যুক্তি এই যে, এতে মসজিদসমূহ শির্ক হতে মুক্ত থাকবে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ ঃ- মসজিদসমূহ আল্লাহর জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহর সহিত অন্য কাউকেও আহবান করো না। *(সূরা জিন ১৮ আয়াত)*

প্রমাণসিদ্ধ যে, রসূল ﷺ তাঁর স্বগৃহে সমাধিস্থ হয়েছেন, মসজিদে তাঁকে দাফন করা হয়নি। কিন্তু উমাবীরা যখন মসজিদ প্রশস্ত করেন তখন কবরকে মসজিদে শামিল করে নেন। হায়! যদি তাঁরা একাজ না করতেন!

হুসাইন ﷺ-এর কবর বর্তমানে মসজিদের ভিতরে। কিছু লোক তার তওয়াফ করে এবং তাঁর নিকট তাদের প্রয়োজন ভিক্ষা করে; যা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট চাওয়া যায় না। যেমন, রোগ নিরাময়, সঙ্কট দূরীকরণ প্রভৃতি। আমাদের দ্বীন আমাদেরকে এসব কিছু কেবল আল্লাহরই নিকট যাঞ্ছা করতে এবং শুধু কা’বারই তওয়াফ করতে আদেশ করে। আল্লাহ তাআলা বলেন, ( )

অর্থাৎ, এবং তারা যেন প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে। *(সূরা হজ্জ ২৯ আয়াত)*

২। মিসর ও দামেস্কে সাইয়েদা যয়নাব বিনতে আলীর দর্গা সত্য নয়। কারণ তাঁর মৃত্যু না মিসরে হয়েছে না সিরিয়ায়। এর দলীল এই যে, উভয় স্থানেই তাঁর দর্গা বিদ্যমান রয়েছে!!

৩। কবরের উপর গম্বুজ বা কুব্বা নির্মাণে এবং সত্যি হলেও মসজিদের ভিতর কবর দেওয়ায় ইসলাম স্বীকৃতি জানায় না। যেমন ইরাকে হুসাইনের, বাগদাদে আব্দুল কাদের জীলানীর, মিসরের শাফেয়ীর কবর রয়েছে; যাতে ইসলামের অনুমতি নেই। যেহেতু এ বিষয়ে সাধারণ নিষেধাজ্ঞা এসেছে -যেমন পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে।

এক সত্যবাদী আমাকে বর্ণনা করেন যে, তিনি এক ব্যক্তিকে কেবলার পরিবর্তে জীলানীর কবরের প্রতি সম্মুখ করে নামায পড়তে দেখলে তাঁকে

নসীহত করেন। কিন্তু লোকটি তা উপেক্ষা করে তাঁকে বলে, 'তুমি ওয়াহাবী!' যেন সে রসূল ﷺ-এর এই বাণী শুনেনি, "তোমরা কবরের উপর উপবেশন করো না এবং তার প্রতি সম্মুখ করে নামায পড়ো না।" *(মুসলিম)*

৪। মিসরের অধিকাংশ দর্গাসমূহকে ফাতেমিয়্যাহ (10) নামক সরকার নির্মাণ করেছে। ইবনে কাসীর তাঁর গ্রন্থ 'আল-বিদায়াহ অন নিহায়াহ' ১১খন্ডের ৩৪৬ পৃষ্ঠায় তাদের প্রসঙ্গে বলেন, "(ফাতেমী শাসকগোষ্ঠী) কাফের, ফাসেক, পাপাচার, ধর্মধ্বজী, ধর্মদ্রোহী, আল্লাহর সিফাত (গুণাবলী) অস্বীকারকারী ও ইসলাম অস্বীকারকারী মজূসী ধর্ম-বিশ্বাসী ছিল।"

ঐ কাফেরদল তখন শঙ্কিত হল যখন দেখল যে, সমস্ত মসজিদ নামাযীতে পরিপূর্ণ হচ্ছে অথচ তারা নিজেরা নামায পড়ে না, হজ্জ করে না এবং মুসলিমদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। তাই তারা মানুষকে মসজিদ হতে বিমুখ করার জন্য ফন্দী আঁটল। নির্মাণ করল বহু গম্বুজ, দর্গা এবং মিথ্যা মাযার; ধারণা করল যে, ঐ সবে হুসাইন বিন আলী এবং যয়নাব বিনতে আলী আছেন। দর্গার দিকে মানুষকে আকর্ষণের উদ্দেশ্যে সেখানে বিভিন্ন অনুষ্ঠান (উরস, মেলা প্রভৃতি) উদ্‌যাপন আরম্ভ করল। এবং নিজেদের প্রতি মানুষকে আকৃষ্ট করার উদ্দেশ্যে গুপ্ত থেকে নিজেদের নাম 'ফাতেমী' রাখল। অতঃপর মুসলিমরা তাদের নিকট হতে ঐ সমস্ত বিদআত গ্রহণ করল, যা তাদেরকে শির্কে নিপতিত করল এবং ঐ সবের পশ্চাতে প্রচুর অর্থ ব্যয় করতে লাগল। অথচ তাদের দ্বীন ও সম্ভ্রমের প্রতিরক্ষার জন্য অস্ত্র-শস্ত্র ক্রয় করতে ঐ অর্থ তাদের একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

৫। মুসলিমরা যে অর্থ দর্গা, মাযার, আস্তানা প্রভৃতি নির্মাণের উদ্দেশ্যে খরচ করে থাকে তা মৃত (সমাধিস্থ) ব্যক্তির কোন উপকার সাধন করে না। অথচ ঐ অর্থ যদি তারা দরিদ্রদেরকে দান করত, তাহলে জীবিত ও মৃত সকলেই উপকৃত হত। পরন্তু বিদিত যে, কবরের উপর ইমারত নির্মাণকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে; যেমন পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

---

(১০) এদের আসল নাম 'উবাইদিয়্যিন।' উবাইদ বিন সা'দ এর প্রতি সম্বন্ধ। ইবনে কাসীর এই নামটি তাঁর গ্রন্থ 'আল-বিদাআহ অন-নিহায়াহ' (১১/৩৪৬)তে উল্লেখ করেছেন।

মহানবী ﷺ আলী ﷛-কে সম্বোধন করে বলেছিলেন, "কোনও মূর্তি না ভেঙ্গে এবং কোন উঁচু কবর (ভূমি) বরাবর না করে ছেড়ো না।" *(মুসলিম)* (অর্থাৎ কোন সুউচ্চ কবর না ভেঙ্গে এবং ভূমি বরাবর সমান না করে ছেড়ো না।) অবশ্য চেনার জন্য কবরকে বিঘত পরিমাণ উঁচু করতে ইসলাম অনুমতি দিয়েছে।

৬। যে সমস্ত নযর-নিয়ায মৃতদের নামে পেশ করা হয় তা শির্কে আকবর। দর্গার খাদিমরা তা ভক্ষণ করে। হয়তো বা পাপাচারে ও প্রবৃত্তি পূজাতেও তা ব্যয় করে থাকে। যাতে নযর পেশকারী ও দাতা ঐ খাদিমের পাপের ভাগী হয়।

পক্ষান্তরে যদি সে ঐ অর্থ সদ্‌কার নামে গরীবদেরকে দান করে, তাহলে মৃত ও জীবিত সকলেই উপকৃত হয় এবং সদকাদাতারও প্রয়োজন পূর্ণ হয়।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদেরকে সত্যকে সত্যরূপে দেখাও এবং তার অনুসরণ করার প্রেরণা দাও ও তার প্রতি আমাদের মাঝে প্রেম সৃষ্টি কর। আর বাতিলকে বাতিলরূপে দেখাও এবং তা বর্জন করার প্রেরণা দাও ও তার প্রতি আমাদের মাঝে ঘৃণা সৃষ্টি কর।

শির্কের বিপত্তি ও অপকারিতা

ব্যক্তিক ও সামাজিক জীবনে শির্কের বহু সংখ্যক বিপত্তি ও অপকারিতা রয়েছে। যার মধ্যে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিপত্তিগুলো নিম্নরূপ ঃ-

১- শির্ক মানবতার অপমান।

শির্ক মানুষের সম্মানহানি করে এবং তার কদর ও মর্যাদা অধঃপাতিত করে দেয়। যেহেতু আল্লাহ মানুষকে পৃথিবীতে প্রতিনিধিরূপে প্রেরণ বা সৃষ্টি করেছেন, তাকে যথার্থ মর্যাদা দান করেছেন, যাবতীয় বিষয়ের নাম শিক্ষা দিয়েছেন, তাঁর তরফ হতে তিনি তার জন্য আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সকল বস্তুকে অধীনস্থ করে দিয়েছেন এবং এ বিশ্বচরাচরের সকল কিছুর উপর তাকে কর্তৃত্ব দান করেছেন। কিন্তু সে আত্মমর্যাদা বিস্মৃত করে এই বিশ্বেরই কিছু

উপাদানকে নিজের পূজ্য উপাস্যরূপে গ্রহণ করেছে ; যার সম্মুখে সে প্রণত ও অবনত হয়! এর চেয়ে মানুষের অধিক হীনতা আর কি হতে পারে যে, আজও পর্যন্ত কোটি-কোটি লোক গাভীর উপাসনা করে; যাকে আল্লাহ জীবিতাবস্থায় মানুষের সেবার জন্য এবং যবেহ করে তার মাংস ভক্ষণের জন্য সৃষ্টি করেছেন!

আবার কত শত মুসলিমকে আপনি দেখবেন তারা মৃতের কবরের উদ্দেশ্যে ধ্যানরত হয়। মৃতের নিকট নিজেদের প্রয়োজন ভিক্ষা করে। অথচ তারাও তাদেরই মত আল্লাহর দাস, যারা নিজেদের মঙ্গলামঙ্গলের উপর কোন ক্ষমতা রাখে না। সুতরাং হুসাইন ﷺ নিজের উপর থেকে হত্যা প্রতিহত করতে পারেন নি, অতএব অপরের নিকট থেকে বিপদ কিরূপে দূর করতে পারেন এবং তার উপকার সাধন করতে পারেন?

পক্ষান্তরে পরলোকগত মানুষরা জীবিত মানুষদের দুআর মুখাপেক্ষী। সুতরাং আমরা তাদের জন্যই দুআ করব এবং আল্লাহর পরিবর্তে তাদের নিকটে দুআ (প্রার্থনা) করব না বা বিপদে তাদেরকে আহবান করব না। আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে আহবান করে তারা কিছু সৃষ্টি করে না বরং তাদেরকেই সৃষ্টি করা হয়। তারা নিষ্প্রাণ এবং তাদেরকে কবে পুনরুত্থিত করা হবে সে বিষয়ে তাদের কোন চেতনা নেই। *(সূরা নাহল ২০-২১ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

( )

অর্থাৎ, এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর অংশী স্থাপন করে সে যেন আকাশ হতে পড়ে, অতঃপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে যায় অথবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করে। *(সূরা হজ্জ ৩১ আয়াত)*

২ - শির্ক কুসংস্কার ও অমূলক বিশ্বাসের বাসা।

কারণ যে ব্যক্তি বিশ্বাস রাখে যে, এই বিশ্বে আল্লাহ ব্যতীত কোন নক্ষত্র, জিন, ব্যক্তিত্ব বা রূহেরও প্রভাব-ক্ষমতা আছে সে ব্যক্তির মন ও মস্তিষ্ক প্রত্যেক কুসংস্কারকে স্থান দেবার জন্য এবং প্রত্যেক দাজ্জাল ও প্রতারক ধর্মধ্বজীকে বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত থাকে। যার ফলে সমাজে শির্ক এবং আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানতে পারে না এমন গায়েবী (অদৃশ্য) খবরের দাবীদার গণক, ভবিষ্যদ্বক্তা, যাদুকর, জ্যোতিষী এবং অনুরূপ অন্যান্য মানুষদের বেসাতি বিস্তার লাভ করে। যেমন এই ধরনের পরিবেশে ঘটনার পশ্চাতে হেতু ও যুক্তি এবং সৃষ্টিগত নিয়মকে উপেক্ষা করার প্রবণতাও ব্যাপক আকার ধারণ করে।

৩ - শির্ক এক বড় অন্যায়।

বাস্তবতা ও প্রকৃতত্বের প্রতি অন্যায়। যেহেতু সর্ববৃহৎ প্রকৃতত্ব এই যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি ব্যতীত কেউ প্রতিপালক ও প্রভু নেই এবং তিনি ছাড়া কেউ বিধানদাতা ও শাসক নেই। কিন্তু মুশরিক গায়রুল্লাহকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে এবং অপরকে বিধাতা মেনে থাকে।

শির্ক আত্মার প্রতি অন্যায়। যেহেতু মুশরিক নিজেকে তারই মত অথবা তার চেয়ে নিম্নমানের কোন সৃষ্টির দাস বানিয়ে দেয়। অথচ আল্লাহ তাকে স্বাধীনরূপে সৃষ্টি করেছেন।

শির্ক অপরের প্রতি অন্যায়। যেহেতু যে ব্যক্তি আল্লাহর সহিত কাউকে অংশী স্থাপন করে, সে ব্যক্তি ঐ অংশীর প্রতি অন্যায় করে, কারণ সে তাকে সেই অধিকার দান করে যা তার প্রাপ্য নয়।

৪। শির্ক ভয় ও অমূলক ধারণা এবং সন্দেহের উৎপত্তিস্থল। যেহেতু যে ব্যক্তি বিভিন্ন কুসংস্কার গ্রহণ করবে এবং অদ্ভুত কর্মকান্ড বিশ্বাস করে নেবে সে নানান দিক থেকে ভীত-শঙ্কিত হবে। কারণ সে একাধিক উপাস্য ও প্রভুর উপর ভরসা রাখে, যাদের প্রত্যেকটাই নিজেদের স্বার্থেও মঙ্গল আনয়ন এবং অমঙ্গল দূরীকরণে অসমর্থ। যার কারণে শির্কী পরিবেশে বাহ্যিক কোন কারণ ব্যতিরেকেই অশুভ ধারণা ও আতঙ্ক ছড়িয়ে থাকে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, কাফেরদের অন্তরে আমি আতঙ্ক সঞ্চার করব, যেহেতু তারা আল্লাহর সহিত শির্ক (অংশী স্থাপন) করেছে যার সপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি। জাহান্নাম তাদের নিবাস এবং অনাচারীদের আবাসস্থল অতি নিকৃষ্ট। *(সূরা আলে ইমরান ১৫১আয়াত)*

৫। **শির্ক ফলপ্রসূ আমল (কর্ম) ব্যাহত করে।** যেহেতু শির্ক তার অনুসারীদেরকে মাধ্যম ও সুপারিশকারীদের উপর ভরসা ও নির্ভর করতে শিক্ষা দেয়। ফলে তারা সৎকর্ম ত্যাগ করে বসে এবং পাপকর্মে আলিপ্ত থাকে, আর বিশ্বাস এই রাখে যে, ওরা তাদের জন্য আল্লাহর দরবারে সুপারিশ করবে। এই বিশ্বাস ছিল ইসলামের পূর্বে আরবদের। যাদের প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

)

(

অর্থাৎ, এবং ওরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা করে তা তাদের ক্ষতি করে না উপকারও করে না। (এই অন্যায় কাজের কৈফিয়ত হিসেবে) ওরা বলে, 'এগুলি আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী।' বল, 'তোমরা কি আল্লাহকে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর এমন কিছুর সংবাদ দেবে যা তিনি জানেন না?! তিনি মহান পবিত্র এবং ওদের শির্ক হতে তিনি বহু উর্ধ্বে। *(সূরা ইউনুস ১৮)*

ঐ খ্রিষ্টানরা, যারা বিশ্বাস রাখে যে, মাসীহকে যখন ক্রুশ-বিদ্ধ করা হয় যেমন ওরা মনে করে -তখন তিনি তাদের সমস্ত পাপ স্খালন বা ক্ষমা করে গেছেন। ফলে তারা বিভিন্ন অসৎ ও নোংরা কর্ম এই বিশ্বাসে করে থাকে।

কিছু মুসলিমও আছে, যারা ওয়াজেব কর্মাদি ত্যাগ করে ও হারাম কর্মাদি করে থাকে আর জান্নাত প্রবেশের জন্য তাদের রসূলের 'শাফাআত' (সুপারিশের) উপর ভরসা রাখে। অথচ রসূল কারীম ﷺ তাঁর কন্যা ফাতেমার উদ্দেশে বলেন, "হে মুহাম্মাদের বেটী ফাতেমা! আমার সম্পদ হতে যা তোমার ইচ্ছা চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর দরবারে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" *(বুখারী)*

৬। শির্ক চিরকাল জাহান্নামে স্থায়ী হওয়ার কারণ।

শির্ক পৃথিবীতে মানুষের ভ্রষ্ট হওয়ার এবং আখেরাতে চিরস্থায়ী আযাব উপভোগের কারণ। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, যে আল্লাহর সহিত শির্ক করবে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নিষিদ্ধ করে দেবেন, তার বাসস্থান হবে জাহান্নাম এবং অনাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। *(সূরা মায়েদাহ ৭২ আয়াত)*

রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি আল্লাহর পরিবর্তে (স্থাপিত) কোন শরীককে ডাকা অবস্থায় মারা যাবে সে জাহান্নাম প্রবেশ করবে।” *(বুখারী)*

উক্ত হাদীসে নিদ্দ্ (সমকক্ষ) এর অর্থ ঃ সমতুল ও অংশী।

৭। শির্ক উম্মাহ্‌কে বিচ্ছিন্ন করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, তোমরা মুশরিকদের দলভুক্ত হয়ো না ; যারা তাদের দ্বীনকে বিচ্ছিন্ন করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে। প্রত্যেক দল নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে সন্তুষ্ট। *(সূরা রূম ৩১ আয়াত)* ([11])

পূর্ববর্তী পরিচ্ছেদগুলি একথাই সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করে যে, শির্ক এমন এক ভয়ানক আপদ যা থেকে বাঁচা, সুদূরে থাকা এবং তাতে আপতিত হওয়ার ভয় করা ওয়াজেব। কারণ শির্ক সর্বাপেক্ষা বড় পাপ; যা বান্দার কৃত সমস্ত সৎকর্মকে পণ্ড ও ধ্বংস করে ফেলে -যে কর্ম জাতীয় কল্যাণ ও মানবিক সেবার উপযোগী হলেও হতে পারে। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

---

(১১) ডক্টর ইউসুফ কারযাবীর গ্রন্থ 'হাক্বীক্বাতুত তাওহীদ' হতে সংক্ষিপ্তভাবে সংগৃহীত।

অর্থাৎ, আমি ওদের (মুশরিকদের) কৃতকর্মের প্রতি অভিমুখ করে তা উড়ন্ত ধূলিকণার ন্যায় (নিষ্ফল) করে ফেলব। *(সূরা ফুরকান ২৩ আয়াত)*
(শায়খ আব্দুল্লাহ আব্দুল গনী খাইরাত্ব এর পুস্তক 'দলীলুল মুসলিম ফিল ই'তিক্বাদ' হতে সমুদ্ধৃত।)

বিধেয় অসীলা গ্রহণ

আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাকে ভয় কর এবং তাঁর নৈকট্যলাভের অসীলা (উপায় ও মাধ্যম) অন্বেষণ কর। *(সূরা মায়েদাহ ৩৫ আয়াত)*

কাতাদাহ (রঃ) বলেন, 'অর্থাৎ তাঁর আনুগত্য এবং সন্তোষজনক আমল (কর্ম) করে তাঁর নৈকট্যলাভ কর।

বিধেয় অসীলা কেবল মাত্র তাই, যার প্রতি কুরআন আমাদেরকে নির্দেশ করেছে, রসূল ﷺ যা বিবৃত করেছেন এবং সাহাবাগণ যা কার্যকর করে গেছেন।

এই বিধেয় অসীলা বিভিন্ন প্রকার ; যার প্রধান প্রধান নিম্নরূপ ঃ-

১। ঈমানের অসীলা। আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের নিজ ঈমানের অসীলায় দুআ করার কথা উল্লেখ করে বলেন,

)

(

অর্থাৎ, (তারা বলে) হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা এক আহবায়ককে ঈমানের দিকে আহবান করতে শুনেছি, 'তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের প্রতি ঈমান আন।' সুতরাং আমরা ঈমান এনেছি। হে আমাদের প্রতিপালক! অতএব তুমি আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আমাদের গোনাহ মোচন কর এবং মৃত্যুর পর সৎলোকদের দলভুক্ত করো। *(সূরা আলে ইমরান ১৯৩ আয়াত)*

২। আল্লাহর তওহীদের অসীলা। যেমন মাছের পেটে ইউনূস আলাইহিস সালামের দুআ ঃ-

আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহবান করল, 'তুমি ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই, তুমি পবিত্র! অবশ্যই আমি সীমালংঘনকারী।' তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তাকে দুশ্চিন্তা হতে উদ্ধার করলাম আর এভাবেই মুমিনদেরকে আমি উদ্ধার করে থাকি। *(সূরা আম্বিয়া ৮৭-৮৮ আয়াত)*

৩। আল্লাহর নামের অসীলা। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, আল্লাহর জন্যই উত্তম নামসমূহ, সুতরাং তোমরা তাঁকে সে সব নামেই আহবান কর। *(সূরা আ'রাফ ১৮০ আয়াত)*

আল্লাহর নামের অসীলায় রসূল ﷺ-এর দুআ, "হে আল্লাহ! আমি তোমার প্রত্যেক নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি।" *(তিরমিযী, তিনি বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ)*

৪। আল্লাহর গুণের অসীলা। যেমন নবী ﷺ-এর দুআ, "হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর! আমি তোমার রহমতের অসীলায় তোমার সাহায্য প্রার্থনা করছি।" *(হাসান, তিরমিযী)*

শায়খ রিফায়ী বলেন, 'আওলিয়াদের প্রতি আল্লাহর মহব্বতের অসীলায় তোমাদের প্রয়োজন আল্লাহর নিকট ভিক্ষা কর।'

৫। নেক আমল; যেমন, নামায, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, অধিকার রক্ষা, আমানতের হিফাযত, দান-খয়রাত, যিকর, কুরআন তেলাঅত, নবী ﷺ-এর উপর দরূদ পাঠ, তাঁর প্রতি এবং তাঁর সাহাবার প্রতি আমাদের মহব্বত প্রভৃতির অসীলা।

সহীহ মুসলিমে গুহায় আশ্রয় গ্রহণকারী ৩ ব্যক্তির কাহিনীতে প্রমাণিত যে, তাঁরা যখন গুহার মধ্যে (এক প্রস্তর দ্বারা) আবদ্ধ হয়ে পড়লেন। তখন একজন

শ্রমিকের পারিশ্রমিক রক্ষা করে আদায় করা ও দ্বিতীয়জন পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করার অসীলায় দুআ করলে আল্লাহ তাঁদেরকে বিপদমুক্ত করলেন।

৬। পাপাচার যেমন মদ্যপান, ব্যভিচার ইত্যাদি হারাম কর্ম বর্জন করার অসীলায় আল্লাহর নিকট দুআ করা। যেমন উপর্যুক্ত গুহা-বন্দীদের তৃতীয় জন ব্যভিচার ত্যাগ করার অসীলায় দুআ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তাঁদেরকে গুহা থেকে উদ্ধার করেছিলেন।

কিন্তু কিছু মুসলিম আছে, যারা নেক আমল করা এবং তার অসীলায় দুআ করা উপেক্ষা করে রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবার পথ ও নীতির বিপরীত চলে মৃত প্রভৃতি অপর ব্যক্তির আমলের অসীলার আশ্রয় গ্রহণ করে!!

৭। জীবিত আম্বিয়া ও সালেহীনদের নিকট দুআর আবেদন করে সেই অসীলায় দুআ। হাদীস শরীফে বর্ণিত যে, এক অন্ধ ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে বলল, 'আপনি আল্লাহর নিকট দুআ করুন, যেন আল্লাহ আমাকে অন্ধত্ব থেকে মুক্ত করেন।' তিনি বললেন, "যদি তুমি চাও তোমার জন্য দুআ করব। নচেৎ যদি চাও ধৈর্য ধর এবং সেটাই তোমার জন্য শ্রেয়।" লোকটি বলল, 'বরং আপনি দুআ করুন।'

সুতরাং তিনি তাকে ওযু করতে বললেন এবং ভালোরূপে ওযু করে দু'রাকআত নামায পড়ে এই দুআ করতে আদেশ দিলেন ঃ-

'হে আল্লাহ! আমি তোমার নিকট প্রার্থনা করছি। তোমার নবী, দয়ার নবীর সহিত তোমার অভিমুখ হচ্ছি। হে মুহাম্মদ! আমি আপনার সহিত আমার প্রতিপালকের প্রতি আমার এই প্রয়োজন পূরণের ব্যাপারে অভিমুখী হয়েছি। হে আল্লাহ! আমার ব্যাপারে তুমি এঁর সুপারিশ গ্রহণ কর এবং এঁর ব্যাপারে তুমি আমার সুপারিশ গ্রহণ কর।'

বর্ণনাকারী বলেন যে, অতঃপর ঐ ব্যক্তি ঐরূপ করলে সে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেল। *(সহীহ, মুসনাদে আহমাদ)*

উক্ত হাদীসটি একথা স্পষ্ট করে যে, রসূল ﷺ তাঁর জীবদ্দশায় ঐ অন্ধের জন্য দুআ করেছিলেন এবং আল্লাহও তাঁর দুআ মঞ্জুর করেছিলেন। অনুরূপ তিনি ঐ লোকটিকে নিজের জন্য দুআ করতে এবং নবীর দুআর সহিত আল্লাহর অভিমুখী হতে আদেশ করেছিলেন। ফলে আল্লাহ তার নিকট হতে

তার আবেদন গ্রহণ করেন। সুতরাং এই দুআ তাঁর জীবনকাল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ। তাঁর মৃত্যুর পর অনুরূপ দুআ করা সম্ভব নয়। যেহেতু সাহাবাগণ এরূপ করেন নি। এবং এই ঘটনার পর অন্যান্য অন্ধ ব্যক্তিরা ঐ রূপ দুআ করে উপকৃত হয়নি।

অবৈধ অসীলা গ্রহণ

অবৈধ ও নিষিদ্ধ অসীলা তাই, যার কোন মূলভিত্তি দ্বীনে নেই। এই অবৈধ অসীলাও কয়েক প্রকার ঃ-

১। মৃত মানুষদের অসীলা। তাদের নিকট প্রয়োজন ভিক্ষা বা সাহায্য প্রার্থনা করা যেমন বর্তমান যুগের পরিস্থিতি। লোকে একে অসীলা মানা বলে থাকে, অথচ বাস্তব প্রেক্ষাপট তা নয়। যেহেতু অসীলা গ্রহণ হল বিধেয় মাধ্যম। যেমন ঈমান, নেক আমল এবং আল্লাহর সুন্দর ও পবিত্রতম নামাবলীর অসীলায় আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করা। কিন্তু মৃতদেরকে ডাকা তো আল্লাহ থেকে বিমুখতা প্রকাশ করা; যা শির্কে আকবরের পর্যায়ভুক্ত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, আল্লাহর পরিবর্তে এমন কাউকে আহবান করো না যে তোমার উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না। যদি তা কর তাহলে তুমি সীমালংঘনকারী (মুশরিক)দের দলভুক্ত হবে। *(সূরা ইউনুস ১০৬ আয়াত)*

২। রসূলের মর্যাদার অসীলা ঃ যেমন, 'হে প্রভু! মুহাম্মাদের মর্যাদার অসীলায় আমাকে আরোগ্য দান কর--' বলা বিদআত। কারণ সাহাবাগণ এমনটি করে যাননি। পক্ষান্তরে খলীফা উমর ﵁ বৃষ্টি প্রার্থনার সময় আব্বাস ﵁-এর জীবিতকালে তাঁর দুআর অসীলা গ্রহণ করেছিলেন; কিন্তু তাঁর চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি পরলোকগত রসূল ﷺ -কে অসীলা করে দুআ করেন নি।

প্রকাশ থাকে যে, "আমার মর্যাদার অসীলায় প্রার্থনা কর।" হাদীসটি ভিত্তিহীন; ([12]) যেমন শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়্যাহ একথা উল্লেখ করেছেন।

পরন্তু এই বিদআতী অসীলা শির্কের পর্যায়েও পড়তে পারে। যেমন যদি বিশ্বাস রাখে যে, আল্লাহ আমীর ও রাজাদের মত মাধ্যম ও মধ্যস্থতার মুখাপেক্ষী তবে তা শির্ক। কেন না এতে সে স্রষ্টাকে সৃষ্টির সাথে তুলনা করে বসে!

আবু হানীফা বলেন, 'গায়রুল্লাহর অসীলায় আল্লাহর নিকট চাওয়াকে আমি ঘৃণ্য আচরণ মনে করি।' *(আদ-দুর্রুল মুখতার)*

৩। রসূলের পরলোকগমনের পর তাঁর নিকট দুআর আবেদন করা -যেমন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য দুআ করুন।' এই বলা বৈধ নয়। কারণ সাহাবাগণ এরূপ করে যাননি। আবার যেহেতু রসূল ﷺ বলেন, "মানুষ মারা গেলে তিনটি বিষয় ব্যতীত তার সকল আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; প্রবাহমান সদকা (ইষ্টাপূর্ত কর্ম) ফলপ্রসূ ইল্‌ম এবং নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।" *(মুসলিম)*

বিজয় লাভের শর্তাবলী

রসূল ﷺ-এর জীবন-চরিত ও তাঁর জিহাদ বিষয়ক ইতিহাস পাঠ করলে তাঁর জীবনে নিম্নলিখিত পর্যায় দেখতে পাবেন ঃ-

১। **তওহীদের পর্যায়** ঃ রসূল ﷺ মক্কায় ১৩ বছর অবস্থানকালে আপন সম্প্রদায়কে উপাসনা, প্রার্থনা, বিচার-ভার প্রভৃতিতে আল্লাহর একত্ববাদের প্রতি এবং শির্কের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতি ততদিন আহবান করলেন যতদিনে এই বিশ্বাস তাঁর সহচরদের মন-মূলে সুদৃঢ়ভাবে স্থান করে নিল এবং দেখা

---

(১২) তদনুরূপ হযরত আদম আলাইহিস সালামের তওবার সময় মুহাম্মদ ﷺ-এর অসীলায় প্রার্থনা করার হাদীসটিও জাল এবং গড়া হাদীস। -অনুবাদক

গেল যে, তাঁরা এখন নির্ভীক বীরদলরূপে প্রস্তুত হয়েছেন; যাঁরা আল্লাহ ব্যতীত আর কারো ভয়ে মোটেই ভীত নন।

তাই ইসলামের দাওয়াত পেশকারীদের জন্য তওহীদের প্রতি আহবান এবং শির্ক হতে সাবধান করার মাধ্যমেই তাঁদের দাওয়াত আরম্ভ করা ওয়াজেব। যাতে তাঁরা এই কর্মে রসূল ﷺ-এর অনুসারী হন।

২। ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন পর্যায় ঃ

সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত মুসলিম সমাজ গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে তিনি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় হিজরত করলেন। সেখানে সর্বাগ্রে তিনি এক মসজিদ নির্মাণ করলেন। যাতে মুসলিমরা ঐ মসজিদে তাদের প্রতিপালকের ইবাদত আদায়ের জন্য সমবেত হতে পারে এবং তাদের জীবনকে সময় ও নিয়মানুবর্তী করার লক্ষ্যে প্রত্যহ পাঁচবার সমাবেশ করার সুযোগ লাভ হয়। অতঃপর শীঘ্রই তিনি মদীনাবাসী আনসার এবং সম্পদ ও গৃহত্যাগী মক্কাবাসী মুহাজেরীনদের মাঝে ভ্রাতৃত্ব-বন্ধন স্থাপন করে দিলেন। এতে আনসারগণ মুহাজেরীনকে তাঁদের নিজস্ব সম্পদ দান করলেন এবং তাঁদের প্রয়োজনীয় যাবতীয় বস্তু তাঁদের সেবায় উৎসর্গ করে দিলেন।

মদীনাবাসীদের দুটি গোত্র; আওস ও খযরজ। তিনি দেখলেন ঐ দুই গোত্রের মাঝে প্রাচীন শত্রুতা বর্তমান। তাই এদের মাঝে সন্ধি স্থাপন করলেন, তাদের অন্তর থেকে বিদ্বেষ ও বৈরিতা মুছে ফেললেন এবং ঈমান ও তওহীদে পরস্পর সম্প্রীতিশীল ভাই-ভাই রূপে গড়ে তুললেন। যেমন হাদীসে বর্ণিত, "মুসলিম মুসলিমের ভাই---।"

৩। প্রস্তুতি ঃ-

শত্রুর বিরুদ্ধে প্রস্তুতি গ্রহণ করতে কুরআন কারীম মুসলিমকে আদেশ করে,

( )

অর্থাৎ, এবং তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত (সঞ্চয়) কর।" *(সূরা আনফাল ৬০ আয়াত)*

ঐ শক্তির ব্যাখায় রসুল ﷺ বলেন, "জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি।" *(মুসলিম)*

সুতরাং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য যথাযথভাবে অস্ত্র-ক্ষেপণ শিক্ষা করা ওয়াজেব। কামান, ট্যাংক ও বোমারু-বিমান প্রভৃতি ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহারের সময় যে ক্ষেপণ-জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ দরকার তা অর্জন করা সকলের জন্য অত্যাবশ্যক। হায়! যদি স্কুল-কলেজের ছাত্ররা ঐ ক্ষেপণ-জ্ঞান লাভ করত এবং এতে তারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত করত, তাহলে তাদের দ্বীন ও পবিত্র স্থানসমূহের প্রতিরক্ষা করতে অবশ্যই সমর্থ হত। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, ছাত্ররা শুধু বল খেলা এবং তার ম্যাচ অনুষ্ঠান করে নিজেদের মূল্যবান সময় বরবাদ করে, আর তাতে তারা নিজেদের ঊরু উন্মুক্ত করে লোককে প্রদর্শন করে। অথচ ইসলাম আমাদেরকে তা আবৃত রাখতে আদেশ করেছে। অনুরূপ ঐ সমস্ত খেলায় বহু নামাযও (যথা সময়ে না পড়ে) বিনষ্ট করে; যার হিফাযত করতে আল্লাহ আমাদেরকে বিশেষভাবে আদেশ করেছেন।

৪। যখন আমরা তওহীদের বিশ্বাসের প্রতি সকলে প্রত্যাবর্তন করব, তখন আমরা পরস্পর সম্প্রীতিবদ্ধ ভাই-ভাই হব এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে অস্ত্র হস্তে শত্রুর বিরুদ্ধে সম্মিলিতভাবে প্রস্তুত হব, তখন ইনশাআল্লাহ মুসলিমদের বিজয়স্বপ্ন বাস্তবে পরিণত হবে, যেমন রসূল ﷺ এবং তাঁর পর তাঁর সাহাবাবৃন্দের জন্য বিজয় অনিবার্য হয়েছিল। আল্লাহ পাক বলেন,

( )

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহর (মনোনীত দ্বীন প্রতিষ্ঠায়) সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পদ সুদৃঢ় করবেন। *(সূরা মুহাম্মদ ৭ আয়াত)*

৫। পূর্বোক্ত পর্যায়-অনুক্রমের অর্থ এই নয় যে, প্রত্যেক পর্যায়কে পৃথক-পৃথকভাবে অতিবাহিত হবে। অর্থাৎ এ নয় যে, তওহীদের পর্যায়ের সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের পর্যায় একই সাথে সংঘটন ও অতিক্রম সম্ভব নয়। বরং পর্যায়গুলি এক অপরের সাথে সংযুক্তভাবেও অতিক্রম করতে পারে।

মু'মিনদেরকে বিজয়ী করা দায়িত্ব আল্লাহর

আল্লাহ তাআলা বলেন, ( )

অর্থাৎ, মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। *(সূরা রূম ৪৭ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে কারীমায় এ কথাই ব্যক্ত হয়েছে যে, আল্লাহ মুমেনদেরকে সাহায্য ও বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তা এমন এক প্রতিশ্রুতি যার অন্যথা হবে না। সুতরাং তিনি তাঁর রসূলকে বদর, খন্দক প্রভৃতি যুদ্ধে বিজয়ী করেছেন এবং তাঁর পর তাঁর সাহাবাবর্গকে তিনি তাঁদের শত্রুদের উপর বিজয়ী করেছেন। যার ফলে ইসলাম প্রসার লাভ করেছে, বহু দেশ জয় হয়েছে এবং বিভিন্নমুখী অঘটন ও বিপদ সত্ত্বেও মুসলিমগণ জয়ী হয়েছেন। শেষে শুভ-পরিণাম হয়েছে সেই মুমিনদের যাঁরা তাঁদের আল্লাহর প্রতি ঈমান, তাঁর তওহীদ, ইবাদত এবং বিপদে ও সুখে তাঁদের প্রতিপালকের নিকট প্রার্থনাতে সত্যবাদিতার পরিচয় দিয়েছেন। কুরআন মাজীদ বদর যুদ্ধে মুমিনদের অবস্থা বর্ণনা করেছে; যখন তাঁদের সংখ্যা ও যুদ্ধ-সরঞ্জাম নিতান্ত নগণ্য ছিল। তাই তাঁরা তাদের প্রভুর নিকট প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। আল্লাহ বলেন,

( )

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট সকাতর সাহায্য প্রার্থনা করেছিলে তখন তিনি তা মঞ্জুর করেছিলেন (এবং বলেছিলেন) আমি তোমাদেরকে একের পর এক আগমনরত একসহস্র ফিরিশ্তা দ্বারা সাহায্য করব। *(সূরা আনফাল ৯ আয়াত)*

আল্লাহ তাঁদের সেই করুণ নিবেদন শ্রবণ করেছিলেন। তাই তাদের সপক্ষে যুদ্ধ করার জন্য ফিরিশ্তাদল দ্বারা তাঁদেরকে সাহায্য করলেন এবং তিনি ফিরিশ্তাগণকে এই প্রত্যাদেশ করলেন,

( )

অর্থাৎ, তোমরা (কাফেরদের) গ্রীবাদেশে এবং প্রত্যেক অঙ্গুলাগ্রে (সর্বাঙ্গে) আঘাত কর।” *(সূরা আনফাল ১২ আয়াত)*

তখন তাঁরা কাফেরদের গর্দান এবং প্রত্যেক অঙ্গাগ্রে ও গ্রন্থিতে আঘাত হেনেছিলেন। শেষ পর্যন্ত তওহীদবাদী মুমিনগণ বিজয়ের মর্যাদায় ভূষিত হলেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, এবং নিশ্চয় বদর যুদ্ধে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করেছিলেন অথচ তোমরা তখন হীনবল ছিলে। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। *(সূরা আলে ইমরান ১২৩আয়াত)*

বদর যুদ্ধের দিন আল্লাহর রসূল ﷺ-এর এক দুআ ছিল, "আল্লাহ! তুমি আমাকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে তা পূরণ কর। হে আল্লাহ! তুমি আমাকে যার অঙ্গীকার দিয়েছিলে তা প্রদান কর। আল্লাহ গো! আহলে ইসলামের এই জামাআতকে যদি তুমি ধ্বংস করে দাও তাহলে পৃথিবীতে আর তোমার ইবাদত হবে না।" *(মুসলিম)*

বর্তমানে আমরা দেখি যে, মুসলিমগণ অধিকাংশ দেশেই তাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত হচ্ছে বটে, কিন্তু বিজয়লাভ তারা করতে পারছে না। তাহলে এর কারণ কি? মুমিনদেরকে দেওয়া আল্লাহর ওয়াদা কি অন্যথা হয়ে যাচ্ছে? না, তা কক্ষনই নয়। আল্লাহর ওয়াদা কখনই ব্যতিক্রম হয় না। কিন্তু আজ কোথায় সে মুসলিমদল যাদের জন্য আয়াতে উল্লেখিত বিজয় আগত হবে?

আমরা মুজাহেদীনদেরকে জিজ্ঞাসা করি যে ঃ-

১। তারা সেই ইমান ও তওহীদ-সহ জিহাদের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছে কি , যে দুই কর্ম দ্বারা রসূল ﷺ মক্কায় অবস্থান কালে যুদ্ধের পূর্বকালে নিজের দাওয়াত শুরু করেছিলেন ?

২। তারা সেই কারণ ও হেতু (উপায় ও উপকরণ) অবলম্বন করেছে কি? যার আদেশ তাদের প্রতিপালক এই বলে দিয়েছেন,

( )

অর্থাৎ, তোমরা (কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য) যথাসাধ্য শক্তি প্রস্তুত কর।

আর যে শক্তির ব্যাখ্যায় রসূল ﷺ বলেন, "তা হল ক্ষেপণই (তীর বা অন্য কোন অস্ত্র নিক্ষেপ)।

৩। যুদ্ধের সময় তারা কি আল্লাহর নিকট সকাতর প্রার্থনা করেছে এবং কেবল তাঁরই নিকট সাহায্য-ভিক্ষা করেছে? নাকি দুআতে তাঁর সহিত অপরকেও শরীক করেছে এবং তাদের নিকট বিজয় প্রার্থনা করেছে; যাদেরকে তারা আওলিয়া মনে করে থাকে? অথচ তারাও আল্লাহর দাস। যারা নিজেদের ব্যাপারেও ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নয়। একমাত্র আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করার বিষয়ে তারা রসূলের অনুসরণ করে না কেন? ( )

"আল্লাহ কি তাঁর বান্দার জন্য যথেষ্ট নন?" *(সূরা যুমার ৩৬ আয়াত)*

৪। অবশেষে, তারা কি পরস্পর ঐক্যবদ্ধ ও সম্প্রীতিশীল এবং তাদের আদর্শবাণী কি আল্লাহর এই বাণী ?

( )

অর্থাৎ, তোমরা আপোসে বিবাদ করো না; নচেৎ তোমরা সাহস হারাবে এবং তোমাদের চিত্তের দৃঢ়তা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। *(সূরা আনফাল ৪৬ আয়াত)*

৫। পরিশেষে এ কথা বলাই বাহুল্য যে, মুসলিমরা যখন তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং দ্বীনের সেই শিক্ষা ও সংস্কৃতিমূলক প্রগতির প্রতি ধাবমান হতে আদেশকারী নির্দেশাবলী উপেক্ষা করে বসল, তখন তারা সকল জাতি হতে পশ্চাতে পড়ে গেল। পুনরায় যখন তারা আপন দ্বীনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করবে, তখনই তাদের উন্নতি ও মান-মর্যাদা আবারও ফিরে আসবে।

৬। অভীষ্ট ঈমান বাস্তবায়িত হলে প্রতিশ্রুত বিজয় সুনিশ্চিত হয়ে আসবে।

( )

যেহেতু, "মুমিনদেরকে সাহায্য ও বিজয়ী করার দায়িত্ব আল্লাহ স্বয়ং নিয়েছেন।" ([13])

---

(১৩) মুসলিমদের দুর্দশা ও দুর্গতি লক্ষ্য করে কবি গেয়েছেন,

খোদায় পাইয়া বিশ্ববিজয়ী হল একদিন যারা।
খোদায় ভুলিয়া ভীত পরাজিত আজ দুনিয়ায় তারা।।
খোদার নামের আশ্রয় ছেড়ে
ভিখারীর বেশে দেশে দেশে ফেরে
ভোগ-বিলাসের মোহে ভুলে হায় নিল বন্ধন কারা।।
খোদার সঙ্গে যুক্ত সদাই ছিল যাহাদের মন,

কুফরে আকবর ও তার প্রকারভেদ

কুফরে আকবর (বড় কুফরী) তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম হতে বহিষ্কার করে ফেলে, যাকে 'কুফরে ই'তিকাদী' (বিশ্বাসগত কুফরী)ও বলা হয়। এই কুফরী বহু প্রকার, তন্মধ্যে কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১। মিথ্যায়নের কুফ্র। আর তা হল কুরআন (সহীহ) হাদীস অথবা উভয়ে বর্ণিত কিছু বিষয়কে মিথ্যাজ্ঞান করা। এর দলীল আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

)

(

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর মিথ্যারোপ করে অথবা তার নিকটে আগত সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? কাফেরদের আশ্রয়স্থল জাহান্নামে নয় কি? *(সূরা আনকাবূত ৬৮ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন, ( )

অর্থাৎ, তোমরা কি কিতাবের কিছু অংশে বিশ্বাস (ঈমান) রাখবে এবং কিছু অংশে অবিশ্বাস (কুফরী) করবে? *(সূরা বাক্বারাহ ৮৫ আয়াত)*

২। সত্যজ্ঞান সত্ত্বেও প্রত্যাখ্যান এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার কুফ্র। আর তা হল সত্য স্বীকার করা সত্ত্বেও তার অনুবর্তী না হওয়া; যেমন ইবলিসের কুফ্র। এর দলীল আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

)

(

দুখে-রোগে-শোকে অটল যাহারা রহিত সর্বক্ষণ-
এসে শয়তান ভোগ-বিলাসের
কাড়িয়া লয়েছে ঈমান তাদের
খোদায় হারায়ে মুসলিম আজ হয়েছে সর্বহারা।। -অনুবাদক

অর্থাৎ, আর স্মরণ কর, যখন আমি ফিরিশ্তাবর্গকে বললাম যে, 'তোমরা আদমকে সিজদা কর।' তখন ইবলীস ব্যতীত সকলেই সিজদাবনত হল। সে অস্বীকার করল এবং ঔদ্ধত্য প্রকাশ করল। আর সে ছিল কাফেরদের দলভুক্ত। *(সূরা বাক্বারাহ ৩৪ আয়াত)*

৩। কিয়ামত দিবসের ব্যাপারে সন্দেহ ও সংশয় করার, অথবা ঐ দিবসকে অস্বীকার ও অসত্যজ্ঞান করার কুফ্র। এর দলীল আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

)

(

অর্থাৎ, (দুই বাগান-মালিকের একজন বলল,) আমি মনে করি না যে, কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর আমার প্রতিপালকের প্রতি যদি আমাকে প্রত্যাবৃত্ত হতেই হয়, তবে নিশ্চয়ই আমি এ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট স্থান পাব।' বাদানুবাদের সাথে তার সঙ্গী তাকে বলল, তুমি কি তাঁকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি হতে ও পরে শুক্র বিন্দু হতে সৃষ্টি করেছেন অতঃপর তোমাকে সুন্দর মনুষ্য-আকৃতি দান করেছেন? *(সূরা কাহফ ৩৬-৩৭আয়াত)*

৪। বৈমুখ হওয়ার কুফ্র। আর তা হল ইসলামের অভীষ্ট বিষয় থেকে বৈমুখ্য প্রকাশ করা ও তা বিশ্বাস না করা। এর দলীল আল্লাহর এই বাণী,

( )

অর্থাৎ, কিন্তু কাফেরদেরকে যে বিষয়ে সাবধান করা হয়েছে তা হতে তারা (অবজ্ঞাভরে) মুখ ফিরিয়ে নেয়। *(সূরা আহক্বাফ ৩ আয়াত)*

৫। নিফাক (মুনাফেকী বা কপটতা)র কুফ্র। আর তা হল, মুখে ইসলাম প্রকাশ করা (বাহ্যতঃ মুসলিম বলে দাবী করা) এবং অন্তর ও আমলে (কার্যতঃ) তার বৈপরীত্য করা।

( )

অর্থাৎ, তা এই জন্য যে, ওরা ঈমান আনার পর কুফ্রী (মুনাফেকী) করেছে; ফলে ওদের অন্তরে মোহর মেরে দেওয়া হয়েছে তাই তারা বুঝে না। *(সূরা মুনাফিকূন ৩ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

( )

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে এমন কতক লোক রয়েছে যারা (মুখে) বলে আমরা আল্লাহ ও পরকালে ঈমান এনেছি অথচ (প্রকৃতপক্ষে) তারা মুমিন নয়। *(সূরা বাক্কারাহ ৮ আয়াত)*

৬। অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করার কুফ্র। আর তা হল, দ্বীনের সর্বজন -বিদিত কোন বিষয় যেমন ঈমান অথবা ইসলামের কোন রুক্নকে অস্বীকার করা। তদনুরূপ যে ব্যক্তি নামায ফরয হওয়াকে অস্বীকার ও অগ্রাহ্য করে তা ত্যাগ করে সে কাফের এবং ইসলামী গন্ডির বহির্ভূত হয়ে যায়।

তদনুরূপ সেই বিচারপতি যে আল্লাহর বিচার ও সমাধানকে অস্বীকার করে সেও কাফের। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, এবং আল্লাহর অবতীর্ণ আইনানুসারে যারা বিধান দেয় না, তারাই কাফের। *(সূরা মায়েদাহ ৪৪ আয়াত)*

ইবনে আব্বাস বলেন, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা যে অস্বীকার করে সে অবশ্যই কাফের হয়ে যায়।

কুফ্রে আসগর ও তার প্রকারভেদ

কুফ্রে আসগর (ছোট কুফ্রী) যা তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না। যেমন ঃ-

১। আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করা। এর দলীল আল্লাহ তাআলার বাণী, তিনি মূসা আলাইহিস সালামের সম্প্রদায়ের মু'মিনগণকে সম্বোধন করে বলেন,

( )

অর্থাৎ, স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ঘোষণা করেন, 'তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অধিক দান করব এবং কৃতঘ্ন হলে নিশ্চয় আমার আযাব বড় কঠোর। *(সূরা ইবরাহীম/৭ আয়াত)*

২। কুফ্‌রে আমালী (কর্মগত কুফ্‌রী)। আর তা হল প্রত্যেক সেই পাপকর্ম ও অবাধ্যাচরণ যাকে শরীয়ত কুফ্‌র বলে অভিহিত করেছে অথচ তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির মধ্যে ঈমানের নামও অবশিষ্ট রেখেছে। যেমন নবী ﷺএর উক্তি, "মুসলিমকে গালি-মন্দ করা ফাসেকী এবং তার সহিত যুদ্ধ করা কুফ্‌রী।" *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেন, "ব্যভিচারী যখন ব্যভিচার করে তখন সে মুমিন থেকে ব্যভিচার করে না এবং মদ্যপায়ী যখন মদ্যপান করে তখন সে মুমিন থেকে মদ্যপান করে না।" সুতরাং এই কুফ্‌রী তার সম্পৃক্ত ব্যক্তিকে ইসলাম হতে খারিজ করে দেয় না। পক্ষান্তরে 'কুফ্‌রে ই'তিকাদী' (বিশ্বাসগত কুফ্‌রী) তা করে।

৩। আল্লাহর বিধানকে স্বীকার করে (কোন চাপে পড়ে) আল্লাহর অবতীর্ণকৃত বিধান ছাড়া অন্য বিধান অনুসারে বিচার বা দেশ-শাসন করা।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, মানুষের রচিত বিধানানুসারে বিচারকর্তা অথবা শাসনকর্তা যদি আল্লাহর বিধানকে স্বীকার করে তবে সে যালেম (সীমালংঘন-কারী) ফাসেক, (কাফের নয়)। ইবনে জারীর এই অভিমতকেই গ্রহণ করেছেন। আর আতা' বলেন, '(এরূপ করা) ঐ কুফ্‌রের চেয়ে ছোট কুফ্‌র।'

তাগূত হতে সাবধান

প্রত্যেক সেই পূজ্যমান উপাস্য যে আল্লাহর পরিবর্তে পূজিত হয় এবং সে তার এই পূজায় সম্মত থাকে অথবা আল্লাহ ও তদীয় রসূলের অবাধ্যতায় প্রত্যেক অনুসৃত বা মানিত ব্যক্তিকেই তাগূত বলা হয়।

আল্লাহ যুগে যুগে রসূল প্রেরণ করেছেন; যাতে তাঁরা তাঁদের স্ব-স্ব সম্প্রদায়কে আল্লাহর ইবাদত করতে এবং তাগূত হতে দূরে থাকতে আদেশ করেন। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি প্রত্যেক জাতির নিকট রসূল প্রেরণ করেছি এই প্রত্যাদেশ দিয়ে যে, "তোমরা আল্লাহর ইবাদত কর এবং তাগূত থেকে দূরে থাক।" *(সূরা নাহল ৩৬ আয়াত)*

তাগূত বহু প্রকার। এদের প্রধান হল পাঁচটি ঃ-

১। **শয়তান** ঃ যে গায়রুল্লাহর ইবাদতের প্রতি আহবানকারী। এর দলীল আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

( )

অর্থাৎ, হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ প্রদান করিনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করো না। কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। *(সূরা ইয়াসীন-৬০ আয়াত)*

২। **আল্লাহর বিধান বিকৃতকারী অত্যাচারী শাসক** ঃ যেমন ইসলাম পরিপন্থী আইন-প্রণেতা। এর দলীল, আল্লাহ সম্মত ও সন্তুষ্ট নন এমন বিধান-রচয়িতা মুশরিকদের প্রতিবাদ করে তাঁর বাণী,

( )

অর্থাৎ, ওদের কি এমন কতক অংশীদার আছে, যারা বিধান দেয় এমন দ্বীনের যার উপর আল্লাহ অনুমতি দেননি? *(সূরা শূরা -২১ আয়াত)*

৩। **আল্লাহর অবতীর্ণকৃত বিধান ছেড়ে অন্য বিধানানুসারে বিচারকর্তা শাসক** ঃ যে আল্লাহর অবতীর্ণকৃত সংবিধানকে অচল মনে করে অথবা ভিন্ন সংবিধান অনুযায়ী বিচার ও শাসন করা বৈধ মনে করে। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, এবং আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তদনুসারে যারা বিধান দেয় না তারাই তো কাফের। *(সূরা মায়েদাহ ৪৪ আয়াত)*

৪। আল্লাহ ব্যতীত ইলমে গায়েব (গায়েবী বা অদৃশ্য খবর জানার) দাবীদার। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ ব্যতীত আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর কেউই গায়েব (অদৃশ্যের) খবর জানে না।' *(সূরা নাম্‌ল - ৬৫ আয়াত)*

৫। আল্লাহর পরিবর্তে (নযর-নিয়ায, মানত, সিজদা প্রভৃতি দ্বারা) যার পূজা করা ও যাকে (বিপদে) আহবান করা হয় এবং সে এতে সম্মত থাকে। এর দলীল আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

( )

অর্থাৎ, ওদের মধ্যে যে বলবে, 'তাঁর (আল্লাহর) পরিবর্তে আমিই মাবুদ' তাকে আমি জাহান্নামের শাস্তি প্রদান করব। এভাবে আমি সীমালংঘনকারী-দেরকে শাস্তি প্রদান করে থাকি। *(সূরা আম্বিয়া ২৯ আয়াত)*

জেনে রাখুন যে, তাগূতের সাথে কুফরী করা (তাকে অমান্য ও অস্বীকার করা) মুমিনের জন্য ওয়াজেব। এ ছাড়া সে সরল-সঠিক মুমিন হতে পারে না। এর দলীল আল্লাহ তাআলার এই বাণী,

(

অর্থাৎ, সুতরাং যে তাগূতকে অস্বীকার করবে এবং আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখবে সে অবশ্যই এমন এক সুদৃঢ় হাতল ধারণ করবে যা কখনো ভাঙ্গার নয়। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, প্রজ্ঞাময়। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৬ আয়াত)*

উক্ত আয়াত এ কথারই দলীল যে, যাবতীয় গায়রুল্লাহ (বাতিল) উপাস্যের ইবাদত থেকে না বাঁচা পর্যন্ত আল্লাহর ইবাদত কোন ফল দেবে না। এই অর্থের প্রতিই ইঙ্গিত করে রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ব্যতীত কোন সত্য উপাস্য নেই) বলে এবং আল্লাহর পরিবর্তে পূজ্য যাবতীয় উপাস্যকে প্রত্যাখ্যান করে তার জান ও মাল অবৈধ হয়ে যায়। (অর্থাৎ সে ইসলামী রাষ্ট্রে নিরাপত্তা লাভ করে।)" *(মুসলিম)*

নিফাকে আকবর

মুখে ইসলাম প্রকাশ করা এবং হৃদয় ও মনে কুফরী বিশ্বাস (গুপ্ত) রাখাকে নিফাকে আকবর (বড় মুনাফেকী) বলা হয়। এই নিফাক কয়েক প্রকারের ঃ-

১। রসূল ﷺ-কে অথবা তাঁর আনীত কিছু বিষয়কে মিথ্যাজ্ঞান করা।

২। রসূল ﷺ অথবা তাঁর আনীত কিছু বিষয়ের প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষ পোষণ করা।

৩ -ইসলামের পরাজয়ে আনন্দবোধ অথবা তার বিজয়ে কষ্টবোধ করা।

কাফেরদের অপেক্ষা মুনাফেকদের শাস্তি ও আযাব অধিকতর কঠিন এবং তাদের ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা অধিকতর মারাত্মক। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, অবশ্যই মুনাফিকরা জাহান্নামের (আগুনের) সর্বনিম্নস্তরে থাকবে। *(সূরা নিসা ১৪৫ আয়াত)*

এ জন্যই আল্লাহ তাআলা সূরা বাক্বারার শুরুতে মাত্র দুটি আয়াতে কাফেরদের অবস্থা বর্ণনা করেন এবং মুনাফিকদের অবস্থা বর্ণনা করেন তেরটি আয়াত জুড়ে।

অনুরূপ, সূফীপন্থীদেরকে আমরা মুসলিম মনে করি। তারা নামায পড়ে, রোযাও রাখে; কিন্তু তাদের দ্বারা সংঘটিত বিপদ অতি সাঙ্ঘাতিক। কারণ তারা মুসলিমদের আকীদা ও বিশ্বাস বিকৃত করে গায়রুল্লাহকে ডাকা ও তার নিকট প্রার্থনা করাকে বৈধ মনে করে, যা এক প্রকার শির্কে আকবর। তারা মনে করে, 'আল্লাহ সর্বস্থানেই বিদ্যমান (বিরাজমান) এবং কুরআন ও হাদীসের বিরুদ্ধাচরণ করে আল্লাহর আরশে সমারূঢ় থাকাকে অস্বীকার ও খন্ডন করে।

নিফাকে আসগর

নিফাকে আসগর (ছোট মুনাফেকী) কর্মগত নিফাক (কপটতা)কে বলা হয়। যেমন মুনাফিকদের চরিত্রগুণে কলুষিত সেই মুসলিম যার প্রসঙ্গে রসূল ﷺ বলেন, "মুনাফিকদের লক্ষণ তিনটি; কথা বললে মিথ্যা বলে, প্রতিশ্রুতি দিলে তা ভঙ্গ করে, এবং তার নিকট কিছু আমানত রাখা হলে খিয়ানত (বিনষ্ট) করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "চারটি গুণ যার মধ্যে পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক হবে; আর যার মধ্যে ঐ গুণসমূহের একটি গুণ হবে, তা বর্জন না করা পর্যন্ত তার মধ্যে মুনাফেকীর এক আচরণ বিদ্যমান থাকবে; কথা বললে মিথ্যা বলা, অঙ্গীকার করলে ভঙ্গ করা, চুক্তি করলে ভঙ্গ করা এবং বাদানুবাদ করলে অশ্লীল বলা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অবশ্য এই নিফাক তার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে ইসলাম থেকে বহিষ্কার করে না। তবে তা কাবীরা গোনাহ (মহাপাপ) নিশ্চয় বটে।

ইমাম তিরমিযী বলেন, 'উলামাগণের নিকট উক্ত (হাদীসের) অর্থ, কর্মগত নিফাক (কপটতা)। মিথ্যাজ্ঞান করার নিফাক তো রসূল ﷺ-এর যুগেই ছিল। *(জামেউল উসূল ১১ খন্ড ৫৬৯ পৃষ্ঠা হতে সংগৃহীত)*

রহমানের আওলিয়া ও শয়তানের আওলিয়া

আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, জেনে রাখ! আল্লাহর আওলিয়া (বন্ধু)দের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না; যারা ঈমান এনে তাকওয়ার কর্ম করে। *(সূরা ইউনুস ৬২ আয়াত)*

এই আয়াত নির্দেশ করে যে, মুমিন ও মুত্তাকী ব্যক্তি মাত্রই অলী; যিনি যাবতীয় পাপাচার হতে দূরে থাকেন, নিজ প্রতিপালককেই আহবান করেন এবং তাঁর সহিত অন্যকে শরীক করেন না। এমন অলীর নিকট প্রয়োজনে কারামতও প্রকাশ পায়, যেমন মারয়্যামের কারামত ছিল তিনি তাঁর গৃহে খাদ্য-সামগ্রী উপস্থিত পেতেন।

সুতরাং বেলায়ত (অলী হওয়া যায় একথা) প্রমাণিত। কিন্তু বেলায়তের যোগ্য একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত তওহীদবাদী মুমিন। পক্ষান্তরে অলী হওয়ার জন্য তাঁর হাতে কারামত প্রকাশ কোন শর্ত নয়। যেহেতু কুরআন এ শর্ত আরোপ করেনি।

গায়রুল্লাহকে আহবানকারী কোন মুশরিক বা ফাসেকের হাতে কারামত প্রকাশ পেতে পারে না। গায়রুল্লাহকে ডাকা মুশরিকদের কর্ম। সুতরাং তারা সম্মানিত আওলিয়া কি করে হতে পারে? অনুরূপ বেলায়ত পূর্বপুরুষদের নিকট হতে উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্য কোন (খেলাফতী) বস্তু বা বিষয় নয়। বরং তা ঈমান এবং নেক আমলের বলে প্রাপ্য অমূল্য উপহার।

পক্ষান্তরে কিছু বিদআতীরা যা প্রদর্শন করে থাকে; যেমন লৌহশলাকা দ্বারা উদরে আঘাত, অগ্নিভক্ষণ প্রভৃতি -তা শয়তানদের কর্মকাণ্ড। এ আল্লাহর তরফ থেকে তাদের জন্য এক প্রকার শৈথিল্য, যাতে তারা ভ্রষ্টতায় চলমান থাকে। আল্লাহ বলেন,

( )

অর্থাৎ-বল, যারা বিভ্রান্তিতে আছে আল্লাহ তাদেরকে প্রচুর ঢিল দেবেন। *(সূরা মারয়্যাম ৭৫ আয়াত)*

যারা ভারত সফর করেছে তারা অগ্নিপূজকদের নিকট এর চেয়ে অধিক বিস্ময়কর কর্ম দেখেছে, যেমন তাদের একে অপরকে তরবারি দ্বারা আঘাত করা (জিভে সিক ও পেটে ছুরি গাঁথা) ইত্যাদি, অথচ তারা কাফের! ইসলাম সে সব কর্মে স্বীকৃতি দেয় না, যে সব কর্ম রসূল ﷺ ও তাঁর সাহাবাগণ করেননি। যদি তাতে কোন মঙ্গল থাকত, তবে আমাদের চেয়ে অধিকতর যত্নের সাথে তাঁরাই সে কাজ পূর্বেই করে যেতেন।

অনেক মানুষের ধারণা যে, যে গায়েব জানে সেই ব্যক্তিই অলী। অথচ এ (অদৃশ্য জানার) গুণ একমাত্র আল্লাহ্র বৈশিষ্ট্য। অবশ্য তিনি ইচ্ছা করলে তাঁর কোন কোন রসূলকে তা প্রকাশ করে থাকেন। তিনি বলেন,

(...)

অর্থাৎ, তিনি অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। মনোনীত রসূল ব্যতীত তিনি তাঁর অদৃশ্যের (গায়েবী) খবর কারো নিকট প্রকাশ করেন না। *(সূরা জিন ২৬-২৭ আয়াত)*

অতএব উক্ত আয়াতে আল্লাহর গায়েবী জ্ঞান প্রকাশের ব্যাপারে কেবল রসূলকেই নির্দিষ্ট করা হয়েছে। এখানে অন্য কারোর উল্লেখ নেই।

কিছু লোক তো কোন কবরের উপর গম্বুজ নির্মিত দেখেই মনে করে ঐ কবরবাসী নিশ্চয় অলী। অথচ বাস্তবে ঐ কবর কোন ফাসেকেরও হতে পারে অথবা কবরে কেউ (সমাহিত) না-ও থাকতে পারে।

পক্ষান্তরে কবরের উপর ইমারত নির্মাণকে ইসলাম হারাম ঘোষণা করেছে। হাদীসে বর্ণিত, নবী ﷺ কবরকে পাকা ও চুনকাম করতে এবং তার উপর ইমারত বানাতে নিষেধ করেছেন। *(মুসলিম)*

সুতরাং অলী সেই নয়, যাকে মসজিদে সমাধিস্থ করা হয়েছে অথবা তার মাযার নির্মাণ করা হয়েছে অথবা তার কবরের উপর গম্বুজ তৈরী করা হয়েছে। যেহেতু এসব কর্ম ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী। যেমন নিদ্রাবস্থায় মৃতব্যক্তিকে স্বপ্নে দেখা তার অলী হওয়ার শরয়ী দলীল নয়। কারণ তা শয়তানের তরফ থেকে অর্থহীন বাজে স্বপ্নও হতে পারে।

কারামত নয়, খুরাফাত

'তওহীদ' পত্রিকায় 'দসূকী প্রসঙ্গে কুসংস্কার' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে, যাতে বলা হয়েছে ঃ

"সা-বীর টীকায় লিখিত যে, তিনি (দসূকী) সর্বপ্রকার ভাষায় কথা বলতেন; অনারবী, সিরিয়, পশু-পক্ষীর ভাষা প্রভৃতি। তিনি মাতৃক্রোড়ে রোযা রেখেছেন, 'লওহে মাহফূয' দর্শন করেছেন, তাঁর পায়ের জন্য পৃথিবী সঙ্কুলান নয়, তিনি তাঁর মুরীদ (ভক্তের) নামকে দুর্ভাগ্য হতে সৌভাগ্যের (খাতায়) স্থানান্তরিত করেন, পৃথিবীকে তাঁর হস্তে অঙ্গুরীয়র মত করে দেওয়া হয়েছে এবং তিনি 'সিদ্রাতুল মুন্তাহা' অতিক্রম করেছেন।"

অথচ এসব কথাগুলি অলীক এবং বাতিল; যা অজ্ঞ ও মূর্খ ব্যতীত অন্য কেউ বিশ্বাস করবে না। বরং এসব স্পষ্ট কুফর। কি ভাবে 'লওহে মাহফূয' সম্পর্কে অবগত হলেন, যে বিষয়ে সৃষ্টির সর্দার ﷺ অবগত ছিলেন না ?

আর কি রূপেই বা তিনি তাঁর ভক্ত দরবেশদের নাম দুর্ভাগ্য হতে সৌভাগ্যে স্থানান্তরিত করেন?

এসবের প্রত্যেকটাই কুসংস্কার ও অমূলক ধারণা মাত্র; যা সূফী (দরবেশ) পন্থীরা গর্বের সাথে বর্ণনা করে থাকে। অথচ তাদের এ হুঁশ নেই যে, তারা প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে অবস্থান করে।

সুতরাং প্রিয় পাঠক! এই শ্রেণীর কুসংস্কারমূলক বই-পুস্তক পাঠ করা হতে সাবধান হন। শা'রানীর আত্ব-ত্বাবাকাতুল-কুবরা, খাযীনাতুল-আসরার, নুযহাতুল-মাজালিস, আর-রওযুল-ফায়েক্ব, গাযালীর মুকাশাফাতুল -কুলূব, সাআলাবীর আল-আরায়েস প্রভৃতি। যেহেতু এসবগুলি এমন বই যা প্রতিবাদ ও খন্ডন উদ্দেশ্য ছাড়া পাঠ করা, ছাপা ও ক্রয়-বিক্রয় করা হারাম।

ঈমানের শাখা-প্রশাখা

রসূল ﷺ বলেন, "ঈমান ষাটের অধিক শাখাবিশিষ্ট; যার উত্তম (ও প্রধান) শাখা 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহ' (আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই) বলা এবং সবচেয়ে ক্ষুদ্র শাখা পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।" *(মুসলিম)*

ইবনে হিব্বান যা উপস্থাপিত করেছেন তার সারাংশ পেশ করে হাফেয (ইবনে হাজার) 'ফতহুল বারী'তে বলেন, 'এই শাখা-প্রশাখাগুলি হৃদয়, জিহ্বা এবং দেহের বিভিন্ন কর্মকান্ডেরই অংশ।

১। অন্তর সংক্রান্ত কর্ম ঃ যাবতীয় আকীদাহ্ ও নিয়ত (বিশ্বাস, ইচ্ছা ও উদ্দেশ্য)। আর তা হল ২৪ টি বিষয় ঃ

আল্লাহর প্রতি ঈমান এবং তাঁর সত্তা ও গুণাবলীর প্রতি ঈমান, "তাঁর সদৃশ কোন কিছুই নেই, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।" এ বিষয়ে তাঁর তওহীদ, তিনি ব্যতীত সব কিছু নবঘটিত ও সৃষ্ট- এ বিশ্বাসও পর্যায়ভুক্ত।

তাঁর ফিরিশ্তামন্ডলী, গ্রন্থাবলী, নবী ও রসূলবর্গ এবং তকদীরের ভালো-মন্দের উপর ঈমান। পরকালের উপর ঈমান; আর কবরে প্রশ্নোত্তর, সেখানে

শাস্তি অথবা শাস্তি, পুনর্জীবন ও পুনরুত্থান, হিসাব, মীযান, পুলসিরাত, জান্নাত ও জাহান্নাম এরই শ্রেণীভুক্ত।

আল্লাহকে ভালোবাসা, তাঁর সন্তুষ্টিতে কাউকে ভালোবাসা ও ঘৃণাবাসা। নবী ﷺ-কে ভালোবাসা; আর তাঁর যথার্থ তা'যীম ও সম্মান করা, তাঁর উপর দরূদ পাঠ ও তাঁর সুন্নাহর অনুসরণ করা এর পর্যায়ভুক্ত।

ইখলাস ও বিশুদ্ধ-চিত্ততা; আর রিয়া (লোক প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে ইবাদত করা) ও মুনাফেকী ত্যাগ করা এর অন্তর্ভুক্ত।

তওবা, আল্লাহকেই ভয়, তাঁরই নিকট আশা, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ, অঙ্গীকার পালন, ধৈর্যধারণ, ভাগ্যের উপর সন্তুষ্টি, আল্লাহর উপরই ভরসা, সৃষ্টির প্রতি দয়া এবং বিনয়; আর বয়োজ্যেষ্ঠর প্রতি শ্রদ্ধা এবং বয়োকনিষ্ঠর প্রতি স্নেহ, গর্ব ও অহংকার ত্যাগ, হিংসা, দ্বেষ ও ক্রোধ বর্জন এরই শ্রেণীভুক্ত।

২। জিহ্বা সংক্রান্ত কর্ম ৭ টি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট ঃ

তওহীদ উচ্চারণ (আল্লাহ ব্যতীত কেউ সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহর রসূল এই সাক্ষ্য প্রদান), কুরআন তেলাঅত, ইল্ম (দ্বীনী জ্ঞান) শিক্ষা করা ও দেওয়া, দুআ, যিকর; আর ক্ষমা প্রার্থনা ও তসবীহ পাঠ এরই অন্তর্ভুক্ত, অনুরূপ অসার ও বাজে ক্রিয়া-কলাপ হতে জিহ্বাকে হিফাযতে রাখা।

৩। দৈহিক কর্ম ৩৮টি বিষয়ে সম্পৃক্ত ঃ

(ক) কিছু কর্ম ব্যক্তিক জীবনের সহিত সংযুক্ত, আর তা হল ১৫টি বিষয়;

দেহ ও মনকে পবিত্র রাখা; আর অপবিত্র বস্তুসমূহ হতে দূরে থাকা ও লজ্জাস্থান আবৃত রাখা এরই পর্যায়ভুক্ত। ফরয ও নফল নামায আদায়, যাকাত প্রদান, দাস মুক্তকরণ, বদান্যতা; অন্নদান ও অতিথি সেবা এরই অন্তর্ভুক্ত। ফরয ও নফল রোজা পালন, ই'তিকাফ করা, শবেকদর অন্বেষণ, হজ্জ ও উমরাহ্ পালন, তওয়াফ করা, দ্বীন রক্ষার উদ্দেশ্যে দেশত্যাগ; আর শির্কের দেশ হতে ঈমানের দেশে হিজরত এরই শ্রেণীভুক্ত। নযর পূরণ করা, কসম ও শপথে যথার্থতা অনুসন্ধান (একান্ত প্রয়োজনে হলফ করা), কাফ্ফারাহ আদায় (যেমন, কসম এবং রমযানের দিবসে স্ত্রী সঙ্গমের কাফ্ফারাহ্ আদায়)।

(খ) কিছু পারিবারিক ও আনুগতিক জীবনের সহিত সংযুক্ত, আর তা হল ৬টি বিষয় ঃ

বিবাহ দ্বারা চারিত্রিক পবিত্রতা, পরিবারের অধিকার আদায়, পিতা-মাতার সেবা; আর তাঁদের অবাধ্যতা হতে দূরে থাকা এরই পর্যায়ভুক্ত। সন্তান-সন্ততির প্রতিপালন ও সুশিক্ষার দায়িত্ব পালন, জ্ঞাতি-বন্ধন অক্ষুন্ন রাখা, (আল্লাহর অবাধ্যতা বিনা) প্রভুর আনুগত্য এবং দাসদের সহিত নম্র ব্যবহার।

(গ) কিছু তো সর্বজনীন ও সামাজিক জীবনের সহিত সংশ্লিষ্ট ; আর তা ১৭টি বিষয় ঃ

ন্যায়পরায়ণতার সহিত নেতৃত্ব ও শাসন, জামাআতের মতানুবর্তী হওয়া, শাসকগোষ্ঠীর আনুগত্য করা -যদি তাঁরা পাপকর্মে আদেশ না দেন তবে। মানুষের মাঝে শান্তি, সম্প্রীতি ও সন্ধি স্থাপন; আর খাওয়ারেজ ([14]) ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এর পর্যায়ভুক্ত। সৎ ও সংযমশীলতা (তাক্বওয়া)র কর্মে অপরের সহযোগীতা; আর সৎকার্যের আদেশ ও অসৎকার্যে বাধা প্রদান এরই অন্তর্ভুক্ত। ইসলামী দন্ডবিধি প্রতিষ্ঠা, জিহাদ করা; আর শত্রু-সীমান্তে প্রতিরক্ষার খাতিরে প্রস্তুত থাকা এরই শ্রেণীভুক্ত। আমানত আদায় এবং যুদ্ধ-লব্ধ সম্পদের এক-পঞ্চমাংশ আদায় এরই অন্তর্ভুক্ত। ঋণ দেওয়া ও পরিশোধ করা, প্রতিবেশীর সম্মান করা, সদ্ব্যবহার করা, হালাল উপায়ে অর্থ উপার্জন ও যথাস্থানে তা ব্যয় করা; আর অপচয় ও অযথা ব্যয় না করা এরই পর্যায়ভুক্ত। সালামের জওয়াব দেওয়া, কেউ হাঁচির পর 'আল-হামদুলিল্লাহ' বললে তার প্রত্যুত্তর দান, মানুষের ক্ষতি না করা, অসার ক্রিয়া ও ক্রীড়াদি হতে দূরে থাকা এবং পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা।

পূর্বোল্লেখিত হাদীসটি নির্দেশ করে যে, তওহীদ তথা কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হল ঈমানের সর্বোচ্চ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ পর্যায়। তাই দাওয়াত পেশকারী-দের উচিত প্রথমে সর্বোচ্চ অতঃপর ধাপে ধাপে তদপেক্ষা নিম্নতর পর্যায়ের ঈমান দ্বারা দাওয়াত আরম্ভ করা, ইমারতের দেওয়াল-গাঁথনির পূর্বেই ভিত্তি মজবুত করা এবং প্রথমে অতীব গুরুত্বপূর্ণ অতঃপর অন্যান্য বিষয়ে

---

(১৪) যারা কাবীরা গোনাহর গোনাহগার মুসলিমকে কাফের ও চির জাহান্নামী বলে থাকে।

মনোনিবেশ করা। যেহেতু তওহীদই আরব-অনারব সমস্ত উম্মাহকে ইসলামের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ করেছে এবং তাদেরকে নিয়ে মুসলিম ও তওহীদের রাষ্ট্র রচনা করেছে।

দুর্গতি আসার কারণ ও তা দূরীকরণের উপায়

মানুষের দুর্গতি ও দুর্দশা আসার কারণ এবং আল্লাহ তাঁর বান্দাদের উপর থেকে কিভাবে তা দূর করেন সে কথা কুরআন কারীম উল্লেখ করেছে।যেমন তিনি বলেন,

১। ( )

অর্থাৎ, তা এ জন্য যে, আল্লাহ যে সম্পদ কোন সম্প্রদায়কে দান করেন তা তিনি পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করেছে। *(সূরা আনফাল ৩৫ আয়াত)*

২। ( )

অর্থাৎ, তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে থাকে তা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে থাকেন। *(সূরা শূরা ৩০ আয়াত)*

৩।)

(

অর্থাৎ, মানুষের কৃতকর্মের দরুন জলে-স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে; যাতে তিনি ওদের কোন কোন কর্মের প্রতিফল ওদেরকে আস্বাদন করান, যাতে ওরা (সৎপথে) ফিরে আসে। *(সূরা রূম ৪১ আয়াত)*

৪-)

(

অর্থাৎ, আল্লাহ দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন এমন এক জনপদের যা ছিল নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত, যেখানে সর্বদিক হতে অনায়াসে জীবিকা আসত, অতঃপর তারা আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করল, ফলে তারা যা করত তার কারণে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষুধা ও ভীতির আস্বাদ গ্রহণ করালেন। *(সূরা নাহল ১১২ আয়াত)*

৫। উক্ত আয়াতে কারীমাগুলি বর্ণনা করে যে, আল্লাহ তাআলা ন্যায়পরায়ণ এবং হিকমত ও প্রজ্ঞাময়। আল্লাহ কোন জাতির উপর যে বিপদ অবতীর্ণ করেন তা একমাত্র তাদের আল্লাহর অবাধ্যাচরণ এবং তাঁর নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণের কারণেই; বিশেষ করে তওহীদ হতে দূর হওয়া এবং শির্কের ঘটা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে, যা অধিকাংশ মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে ব্যাপক আকারে ছড়িয়ে পড়েছে এবং যার ফলে তার অধিবাসীরা ভয়ানক ফিতনা ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছে। আর যে ফিতনা কোনদিন দূরও হবে না; যদি না তারা তওহীদের প্রতি এবং তাদের জীবনে, সমাজে ও রাষ্ট্রে তাঁর শরীয়তের চিরন্তন সংবিধান প্রতিষ্ঠাকরণের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে।

৬। কুরআন মুশরিকদের অবস্থা উল্লেখ করে বলে যে, তারা বিপদ ও সঙ্কটমুহূর্তে একমাত্র আল্লাহকে ডাকত, অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে তা হতে উদ্ধার করলে তারা পুনরায় শির্কে ফিরে যেত আর সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্যের সময় গায়রুল্লাহকে ডাকত। আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, ওরা যখন জলযানে আরোহণ করে তখন বিশুদ্ধ-চিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে আল্লাহকে ডাকে; অতঃপর তিনি যখন ওদেরকে উদ্ধার করে স্থলে পৌঁছে দেন, তখন ওরা শির্ক করে। *(সূরা আনকাবূত ৬৫ আয়াত)*

৭। বর্তমান যুগের বহু মুসলমানই কোন বিপদে পড়লে গায়রুল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনার সাথে আর্তনাদ করে ডাকে, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! ইয়া জীলানী! ইয়া রিফায়ী! ইয়া মারগানী! ইয়া বাদবী! ইয়া শায়খাল আরব! (অনুরূপ ইয়া দাতা, ইয়া খাজা, ইয়া বাবা অমুক! ইয়া মুরশিদ! ইত্যাদি) সুতরাং এরা বিপদে ও স্বাচ্ছন্দ্যে উভয় অবস্থাতেই আল্লাহর সহিত শির্ক করে এবং নিজেদের প্রতিপালক ও তাঁর রসূলের কথা ও নির্দেশের বিরুদ্ধাচরণ করে।

৮। উহুদ-যুদ্ধে কিছু তিরন্দাজ সেনাপতির নির্দেশের অন্যথাচরণ করলে মুসলিমগণ পরাজিত হন। এতে সকলে আশ্চর্যান্বিত হলে আল্লাহর নিকট থেকে জওয়াব এল, ( )

অর্থাৎ-বল, এ তোমাদের নিজেদের তরফ হতে। (তোমাদের নিজেদের কর্মদোষে।) *(সূরা আলে ইমরান ১৬৫ আয়াত)*

হুনাইন-অভিযানে কিছু মুসলিম বলেছিলেন যে, 'সংখ্যালঘুদের নিকট আমরা কখনোই পরাজিত হব না!' কিন্তু এরই ফলে পরাজয় তাদেরই ছিল। আল্লাহর নিকট হতে ভর্ৎসনা এল,

(...)

অর্থাৎ, এবং হুনাইনের দিন যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদেরকে চমৎকৃত করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন উপকারে আসে নি। *(সূরা তাওবাহ ২৫ আয়াত)*

৯। উমর বিন খাত্তাব ﷺ তাঁর ইরাকের সেনাপতি সা'দকে লিখেছিলেন, '--- এবং তোমরা বলো না যে, আমাদের শত্রুরা আমাদের অপেক্ষা নিকৃষ্ট; তাই তাদেরকে আমাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে (আল্লাহর তরফ হতে) কখনোই দেওয়া হবে না। যেহেতু কত জাতির উপর তাদের চেয়ে নিকৃষ্টতর শাসকদেরকে আধিপত্য দেওয়া হয়েছে। যেমন বানী ইসরাঈলের উপর তাদের পাপকর্মের ফলে অগ্নিপূজক কাফেরদলকে আধিপত্য দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং তোমরা তোমাদের আত্মার বিরুদ্ধে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও, যেমন তোমরা তোমাদের শত্রুদের বিরুদ্ধে তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করে থাক।'

নবীদিবস উদ্‌যাপন

অধিকাংশ 'ঈদে-মীলাদুন-নবী'র অনুষ্ঠানে যা ঘটে থাকে তা গর্হিত, বিদআত, এবং শরীয়তের বিরুদ্ধাচরণ, এর অন্যথা নয়। পক্ষান্তরে এই ঈদে মীলাদ রসূল ﷺ, তাঁর সাহাবাবৃন্দ, তাবেয়ীবর্গ, চার ইমামগণ এবং শ্রেষ্ঠতম (প্রারম্ভিক) শতাব্দীগুলির অন্য কেউই পালন করে যাননি। আর এর সপক্ষে কোন শরয়ী প্রমাণ ও নেই।

১। মীলাদ-উদ্যোক্তারা অধিকাংশ শির্কে আপতিত হয়ে থাকে। যেহেতু এতে তারা শির্কী না'ত ও গজল আবৃত্তি করে থাকে। যেমন,

'হে আল্লাহর রসূল! মদদ ও সাহায্য
হে আল্লাহর রসূল! আপনার উপরেই আমার ভরসা।
হে আল্লাহর রসূল! আমাদের সঙ্কট দূর করুন,
সঙ্কট তো আপনাকে দেখলেই সরে পড়ে!!'

এ কথা যদি রসূল ﷺ শুনতেন, তাহলে নিশ্চয় তিনি তা শির্কে আকবর বলে অভিহিত করতেন। যেহেতু সাহায্য, মদদ ও সঙ্কটমুক্ত করা একমাত্র আল্লাহর কাজ এবং ভরসাস্থলও একমাত্র তিনিই। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, অথবা কে আর্তের আহবানে সাড়া দেয় যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করে? (এবং কে তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করে? আল্লাহর সঙ্গে কোন উপাস্য আছে কি ?) *(সূরা নাম্‌ল ৬২ আয়াত)*

আল্লাহ তাঁর রসূলকে আদেশ করেন যে,

( )

অর্থাৎ, বল, 'আমি তোমাদের ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নই?' *(সূরা জিনঃ ১ আয়াত)*

আর নবী ﷺ বলেন, "যখন (কিছু) চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট চাও এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহরই নিকট কর।" *(তিরমিযী, আর তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।)*

২। অধিকাংশ মীলাদে রসূল ﷺ-এর প্রশংসায় সীমালংঘন, অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি থাকে; অথচ নবী ﷺ তা নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন, "তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না, যেমন খ্রিষ্টানরা মারয়্যাম পুত্র (ঈসার) করেছে। যেহেতু আমি তো একজন দাস মাত্র, অতএব তোমরা আমাকে 'আল্লাহর দাস ও তাঁর রসূল'ই বলো।" *(বুখারী)*

৩। উরস, মীলাদ প্রভৃতি অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয় যে, আল্লাহ তাঁর নূর (জ্যোতি) হতে মুহাম্মাদকে সৃষ্টি করেছেন এবং তাঁর (মুহাম্মদের) নূর হতে সকল বস্তু সৃষ্টি করেছেন। পরন্তু কুরআন তাদের এই কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ বলেন,

( )

অর্থাৎ, বল, আমি তো তোমাদেরই মত একজন মানুষ; আমার প্রতি প্রত্যাদেশ (ওহী) হয় যে, তোমাদের উপাস্য একমাত্র উপাস্য। *(সূরা কাহ্ফ ১১০ আয়াত)*

আবার একথা সর্বজনবিদিত যে, রসূল ﷺ অন্যান্য মানুষের মতই পিতা-মাতার ঔরস হতেই সৃষ্টি। কিন্তু তিনি ছিলেন আল্লাহর তরফ হতে ওহী দ্বারা মনোনীত ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মানুষ।

তদনুরূপ মীলাদে বলা হয় যে, 'আল্লাহ মুহাম্মাদের জন্যই জগৎ সৃষ্টি করেছেন।(এ বিষয়ে হাদীসগুলো জাল ও গড়া।)

অথচ কুরআন এ কথাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ বলেন,

( )

অর্থাৎ, আমি জিন ও মানুষকে একমাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি। *(সূরা যারিয়াত ৫৬ আয়াত)*

৪। খ্রিষ্টানরা খ্রিষ্টের জন্মোৎসব (মীলাদ) এবং তাদের পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তির জন্মদিন (বার্থডে') পালন করে থাকে। মুসলিমরা এই বিদআত ওদের নিকট হতেই গ্রহণ করে নিয়েছে। তাই এরাও ওদের মত নবীদিবস (ঈদে মীলাদুন নবী) এবং পরিবারের সভ্যদের (বিশেষ করে শিশুদের) 'হ্যাপি বার্থ ডে'র অনুষ্ঠান উদ্‌যাপন করে। অথচ তাদের রসূল তাদেরকে সাবধান করে বলেন, "যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করে সে তাদেরই একজন।" *(সহীহ, আবুদাউদ)*

৫। এই নবীদিবস উপলক্ষে কৃত অনুষ্ঠানে বেশীর ভাগই নারী-পুরুষ ও যুবক-যুবতীর অবাধ মিলামিশা ঘটে থাকে; অথচ এ কাজকে ইসলাম অবৈধ ঘোষণা করেছে।

৬। নবীদিবস উদ্‌যাপনের সাজ-সরঞ্জাম যেমন; রঙিন কাগজ, মোমবাতি প্রভৃতি আড়ম্বরে (সারা বিশ্বে) যে অর্থ খরচ করা হয় তা কয়েক মিলিয়নে গিয়ে পৌঁছে থাকে। অথচ পরে ঐ সব সাজ-সরঞ্জাম অনর্থক পানিতে ফেলে দেওয়া হয়। এতে লাভবান হয় তো শুধু কাফেররা; যারা তাদের দেশ হতে আমদানীকৃত ঐ সাজ-সরঞ্জামের মূল্য কুক্ষিগত করে। পক্ষান্তরে রসূল ﷺ অর্থ নষ্ট করতে নিষেধ করেছেন।

৭। এই উপলক্ষে মঞ্চাদি বানাতে ও সাজাতে লোকেরা যা সময় নষ্ট করে তাতে অনেকে নামাযও ত্যাগ করতে বাধ্য হয়; যেমন আমি লক্ষ্য করেছি।

৮। অভ্যাসগত ভাবে মীলাদের শেষে লোকেরা উঠে দাঁড়িয়ে যায় (কিয়াম করে)। কেননা, তাদের অনেকের বিশ্বাস যে, রসূল ﷺ মীলাদ অনুষ্ঠানে (এর শেষে?) উপস্থিত হন। অথচ এমন বিশ্বাস স্পষ্ট অলীক। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, ওদের (পরলোকগত ব্যক্তিদের) সম্মুখে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত বারযাখ থাকবে। *(সূরা মু'মিন ১০০ আয়াত)*

(বারযাখ, অর্থাৎ ইহকাল ও পরকালের মাঝে এক যবনিকা।)

আনাস বিন মালেক ؓ বলেন, "ওঁদের (সাহাবাদের) নিকট রসূল ﷺ অপেক্ষা অন্য কেউ অধিক প্রিয় (ও শ্রদ্ধেয়) ছিল না। ওঁরা যখন তাঁকে দেখতেন তখন তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। কারণ এতে তাঁর অপছন্দনীয়তার কথা তাঁরা জানতেন।" *(সহীহ, আহমদ ও তিরমিযী)*

৯। ওদের অনেকে বলে থাকে, 'আমরা মীলাদে রসূল ﷺ-এর জীবনচরিত আলোচনা করি।' কিন্তু বাস্তবে ওরা এমন সব করে ও বলে যা তাঁর বাণী ও চরিতের পরিপন্থী। পক্ষান্তরে আসল নবীর প্রেমিক তো সেই ব্যক্তিই যে বৎসরান্তে একবার নয়, বরং প্রত্যহ তাঁর জীবন-চরিত আলোচনা ও পাঠ করে।

পরন্তু রবিউল আওয়াল; যে মাসে (এবং অনেকের মতে, যে দিনে) তাঁর জন্ম ঠিক সেই মাসেই (ও সেই দিনেই) তাঁর মৃত্যু। সুতরাং তাতে শোক-পালনের চেয়ে আনন্দ প্রকাশ নিশ্চয় উত্তম নয়। ([15])

১০। অধিকাংশ মীলাদভক্তরা ঐ তারীখে অর্ধরাত্রি (বরং তারও অধিক) পর্যন্ত জাগরণ করে থাকে ফলে কমপক্ষে ফজরের নামায জামাআতে না পড়ে নষ্টই করে ফেলে অথবা তাদের নামাযই ছুটে যায়।

১১। ঈদে মীলাদ বহু সংখ্যক লোক উদ্যাপন করে থাকলেও (সত্য নিরূপণে) সংখ্যাধিক্য বিবেচ্য নয়। কেননা আল্লাহ তাআলা বলেন,

---

(১৫) অবশ্য শোকপালনও কোন বিধেয় কর্ম নয়। -অনুবাদক

( )

অর্থাৎ, আর যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে। *(সূরা আনআম ১১৬ আয়াত)*

হুযাইফা বলেন, 'প্রত্যেক বিদআতই ভ্রষ্টতা, যদিও সকল লোকে তা সৎকর্ম বলে ধারণা (বা আমল) করে থাকে।'

১২। হাসান বাসরী বলেন, 'অতীতে অল্প সংখ্যক মানুষই আহলে সুন্নাহ ছিল এবং ভবিষ্যতেও তারা অল্পই থাকবে। যারা বিলাসিতায় বিলাসীদের সঙ্গী হয় না এবং বিদআতে বিদআতীদের সাথী হয় না। তাদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎ-কাল পর্যন্ত তারা নিজস্ব নীতি (সুন্নাহর) উপর ধৈর্য ধারণ করে। অতএব এরকমই তোমরাও হও।'

১৩। শাম (সিরিয়া)তে সর্বপ্রথম ঈদে মীলাদ (নবীদিবস) আবিষ্কার করেন শাহ মুযাফ্‌ফর ঠিক হিজরী সপ্তম শতাব্দীর গোড়ার দিকে। মিসরে সর্বপ্রথম চালু করে ফাতেমীরা; যাদের প্রসঙ্গে ইবনে কাসীর বলেন, 'তারা ছিল কাফের, ফাসেক ও পাপাচারী।'

আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালোবাসার ধরন

১। আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ-বল, তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর তাহলেই আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। *(সূরা আলে ইমরান ৩১ আয়াত)*

২। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের মধ্যে কেউ মুমিন হতে পারবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না আমি তার নিকট তার পিতা, সন্তান এবং সকল মানুষ অপেক্ষা প্রিয়তম হয়েছি।" *(বুখারী)*

৩। উক্ত আয়াত বিবৃত করে যে, রসূল ﷺ -এর আনীত বিষয়ের অনুসরণ করে এবং তিনি মানুষের জন্য যা বর্ণনা করে গেছেন সেই সহীহ হাদীসসমূহে উল্লেখিত তাঁর আদেশের আনুগত্য করে ও নিষিদ্ধ বর্জন করেই আল্লাহর মহব্বত ও ভালোবাসা লাভ হয়। অন্যথা তাঁর পথ-নির্দেশের অনুগামী না হয়ে এবং তাঁর আদেশ ও আদর্শের অনুবর্তী না হয়ে কেবল টানা-টানা ও ভঙ্গিমাপূর্ণ কথায় (বুলিতে) তাঁর মহব্বত লাভ হয় না।

৪। আর উক্ত সহীহ হাদীস বর্ণনা করে যে, মুসলিমের ঈমান ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে রসূল ﷺ-কে এমন ভালোবেসেছে, যা তার পিতা সন্তান ও সমস্ত মানুষ, এমনকি নিজেকে যেমন ভালোবাসে তার চেয়েও অধিক গাঢ় ও দৃঢ় হয়; যেমন অন্য এক হাদীসে এর নির্দেশ এসেছে। ভালোবাসার প্রভাব তখনই অভিব্যক্ত হয় যখন রসূল ﷺ-এর আদেশ ও নিষেধ এবং মনের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি, স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি ও তার পরিবেশের সমস্ত মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্খা পরস্পর-বিরোধী ও ভিন্নমুখী হয়। সুতরাং সে যদি সত্য প্রকৃত রসূল-প্রেমিক হয়, তাহলে তাঁর আদেশ-পালনকে প্রাধান্য দেয় এবং তার নিজ মন, স্ত্রী-পরিজন, খেয়ালখুশী ও সকল মানুষের বিরোধিতা করে। আর যদি সে কপট ও ভন্ড প্রেমিক হয়, তাহলে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্যাচরণ করে এবং তার শয়তান ও মন-প্রবৃত্তির বাধ্য ও অনুগত দাস হয়।

৫। যদি আপনি কোন মুসলিমকে প্রশ্ন করেন যে, 'তুমি কি তোমার রসূলকে ভালোবাস? তখন চট্ করে হয়তো সে আপনাকে বলবে, 'অবশ্যই। আমার জান ও মাল তাঁর জন্য কুরবান (উৎসর্গ) হোক।' অতঃপর যদি তাকে প্রশ্ন করেন, 'তাহলে তুমি তোমার দাড়ি চাঁছ কেন? আর অমুক অমুক বিষয়ে তুমি তাঁর বাহ্যিক বেশভূষা, চরিত্র, তওহীদ প্রভৃতিতে তাঁর সাদৃশ্য অবলম্বন কর না কেন?' তখন চট্ করে সে এই বলে আপনাকে উত্তর দেবে, 'ভালোবাসা তো অন্তরে হয়। আমার অন্তর ভালো। আলহামদু লিল্লাহ!!'

কিন্তু আমরা তাকে বলব, 'তোমার অন্তর যদি ভালো হত, তাহলে তার প্রভাব ও প্রতিকৃতি তোমার দেহে পরিস্ফুট হত। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "জেনে রাখ, দেহের মধ্যে এমন এক মাংস-পিন্ড আছে যা ভালো হলে

সারা দেহ ভালো হবে। আর তা খারাপ হলে সারা দেহ খারাপ হবে। শোন! তাহল হৃৎপিন্ড (অন্তর)।" *(বুখারী ও মুসলিম)* (16)

৬। এক মুসলিম ডাক্তারের ডিস্‌পেনসারীতে প্রবেশ করে দেখলাম, দেওয়ালে বহু নারী-পুরুষের ছবি টাঙ্গানো আছে। আমি তাঁকে উপদেশ দিয়ে বললাম যে, আল্লাহর রসূল ﷺ ছবি টাঙ্গাতে নিষেধ করেছেন। কিন্তু তিনি তা প্রত্যাখ্যান করে বললেন, 'ওরা আমার ইউনিভার্সিটির সহপাঠী ও সহপাঠিনী!' অথচ তাদের অধিকাংশই কাফের। বিশেষ করে যুবতীরা যারা তাদের কেশদাম ও সৌন্দর্যকে ছবিতে প্রকাশ করে রেখেছে - আবার তারা সকলেই কমিউনিষ্ট দেশের!!

এই ডাক্তার দাড়িও চাঁছতেন। আমি তাঁকে পুনরায় নসীহত শুরু করলাম। কিন্তু তাঁর আত্মাভিমান তাঁকে পাপাচরণেই অবিচলিত রাখল। বললেন, তিনি দাড়ি চেঁছেই মরবেন! অথচ আশ্চর্যের বিষয় যে, রসূলের নির্দেশ-বিরোধী এই ডাক্তার তাঁর মিথ্যা ভালোবাসার দাবী করেন। আমাকে বললেন, 'বলুন, ইয়া রাসূলাল্লাহ আমি আপনার হিফাযতে!' আমি মনে মনেই বললাম, আপনি তাঁর কথার খেলাফ করে তাঁর হিফাযতে ঢুকতে চাচ্ছেন?! রসূল ﷺ কি এই শির্কে সম্মত হবেন? যেহেতু আমরা এবং রসূল সকলেই একমাত্র আল্লাহর হিফাযতে ও রক্ষণায়।

৭। রসূল ﷺ-এর মহব্বত অনুষ্ঠান উদ্‌যাপনের মাধ্যমে, সৌন্দর্য-বহুল মঞ্চ নির্মাণ করে, অসঙ্গত না'ত ও গজল পাঠ করে এবং এ ছাড়া অন্যান্য ভিত্তিহীন বিদআতী আড়ম্বর প্রদর্শন করে অভিব্যক্ত হয় না। বরং তাঁর মহব্বত অভিব্যক্ত হয় তাঁর পথ-নির্দেশ অনুসরণ করে, তাঁর আদর্শ ও সুন্নাহর অনুকরণ করে এবং তাঁর সমূদয় নির্দেশাবলীকে কার্যকর করে। কবি কি সুন্দরই না বলেছেন,

---

(১৬) আর আল্লাহ বলেন, "উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল তার প্রতিপালকের আদেশে উৎপন্ন হয় এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না।" (সূরা আ'রাফ ৫৮ আয়াত)

-অনুবাদক

'তোমার প্রেম যদি সত্য হত, তাহলে অবশ্যই তুমি তাঁর আনুগত্য করতে। কারণ প্রেমিক তো প্রেমাস্পদের অনুগত হয়।'

দরূদের ফযীলত

আল্লাহ তাআলা বলেন,

)

(

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফিরিশ্তাবর্গ নবীর কথা স্মরণ করেন। হে মুমিনগণ! তোমারও নবীর জন্য দরূদ পাঠ কর এবং উত্তমরূপে সালাম পাঠাও। *(সূরা আহযাব ৫৬ আয়াত)*

ইমাম বুখারী বলেন, আবুল আলিয়্যাহ বলেছেন, 'আল্লাহ তাআলা দরূদ পড়েন, অর্থাৎ তিনি তাঁর ফিরিশ্তাবর্গের নিকট নবী ﷺ-এর প্রশংসা করেন। আর ফিরিশ্তারা দরূদ পড়েন, অর্থাৎ তাঁরা তাঁর জন্য দুআ করেন।'

ইবনে আব্বাস বলেন, 'দরূদ পড়েন; অর্থাৎ বর্কতের দুআ করেন।'

অত্র আয়াতের সারমর্ম; যেমন ইবনে কাসীর তাঁর তফসীরে উল্লেখ করেছেনঃ

"সর্বোচ্চ ফিরিশ্তা-সভায় আল্লাহর নিকট তাঁর বান্দা, নবী ও বন্ধুর মর্যাদা কত, সে প্রসঙ্গে তিনি তাঁর বান্দাদেরকে অবহিত করেন। যেমন, ফিরিশ্তাবর্গের নিকট তিনি তাঁর প্রশংসা করেন এবং ফিরিশ্তামন্ডলীও তাঁর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করেন। অতঃপর তিনি নিম্ন-বিশ্বের অধিবাসীকে তাঁর উপর দরূদ পাঠ করতে আদেশ করেন, যাতে তাঁর উপর সারা বিশ্ব-জগদ্বাসীর প্রশংসা একত্রিত হয়ে যায়।"

১। উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে আদেশ করেন যে, আমরা যেন রসূল ﷺ-এর জন্য দুআ করি এবং তাঁর প্রতি দরূদ পাঠ করি। আর এ নয় যে, আমরা যেন আল্লাহর পরিবর্তে তাঁরই নিকট দুআ করি অথবা তাঁর জন্য ফাতেহাখানী করি; যেমন কিছু লোক তা করে থাকে।

২। রসূল ﷺ-এর উপর দরূদের শ্রেষ্ঠ শব্দবিন্যাস - যা তিনি তাঁর সাহাবাবর্গকে শিখিয়েছিলেন তা নিম্নরূপ ঃ-

))

.

((

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরের উপর দরূদ বর্ষণ কর যেমন তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর দরূদ (করুণা ও শান্তি) বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, গৌরবান্বিত।

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদ ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ কর যেমন তুমি ইব্রাহীম ও তাঁর বংশধরের উপর বর্কত বর্ষণ করেছিলে। নিশ্চয় তুমি প্রশংসিত, গৌরবান্বিত। *(বুখারী ও মুসলিম)*

৩। এই দরূদ এবং নির্ভরযোগ্য হাদীস ও ফিক্‌হ-এর গ্রন্থসমূহে উল্লেখিত অন্যান্য দরূদে 'সাইয়িদিনা' শব্দটির উল্লেখ নেই; যেমন বহু মানুষ দরূদে তা অতিরিক্ত সংযোজন করে থাকে।

অবশ্য একথা বিদিত যে, রসূল ﷺ 'সাইয়িদুনা' (আমাদের সর্দার)। কিন্তু তবুও রসূলের মুখ-নিঃসৃত বাণী ও শব্দবিন্যাসের পূর্ণ অনুসরণ করা এবং তার ব্যতিক্রম না করাই আমাদের জন্য ওয়াজেব। আর ইবাদতের ভিত্তি হল নকল (শুদ্ধ বর্ণনা), আক্‌ল (কারো বিবেক) নয়।

৪। রসূল ﷺ বলেন, "মুআয্‌যিনকে আযান দিতে শুনলে তোমরাও ওর অনুরূপ বল। অতঃপর আমার উপর দরূদ পাঠ কর। কেননা, আমার উপর যে একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার উপর দশবার অনুগ্রহ বর্ষণ করবেন। অতঃপর আমার জন্য আল্লাহর নিকট অসীলা প্রার্থনা কর। যেহেতু 'অসীলা' জান্নাতের এক এমন স্থান যা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে মাত্র একজন বান্দার জন্যই উপযুক্ত। আর আমি আশা করি যে, আমিই সেই বান্দা। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার জন্য অসীলা প্রার্থনা করবে তার জন্য আমার সুপারিশ অবধার্য হয়ে যাবে।" *(মুসলিম)*

রসূল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত অসীলার দুআ যা আযানের পর ইবরাহীমী দরূদ পাঠ করে নিঃশব্দে পাঠ করতে হয় তা নিম্নরূপ ঃ-

))

((

অর্থাৎ ঃ- হে আল্লাহ! হে এই পরিপূর্ণ আহবান ও প্রতিষ্ঠা লাভকারী নামাযের প্রভু! তুমি মুহাম্মাদকে অসীলাহ (জান্নাতের এক মর্যাদাপূর্ণ স্থান) ও ফযীলাহ (মর্যাদা) দান কর এবং তাঁকে তুমি সেই প্রশংসিত স্থানে প্রেরণ কর যার প্রতিশ্রুতি তুমি তাঁকে প্রদান করেছ। *(বুখারী)*

৫। দুআ ও প্রার্থনা করার সময়ও নবী ﷺ-এর উপর দরূদ বাঞ্ছনীয়। কারণ তিনি বলেন, "নবীর উপর দরূদ না পড়া পর্যন্ত প্রত্যেক দুআ অন্তরিত থাকবে।" (অর্থাৎ কবুল করা হবে না)। *(হাসান, বায়হাকী)*

তিনি আরো বলেন, "পৃথিবীতে আল্লাহর ভ্রমণরত বহু ফিরিশ্তা রয়েছেন, যাঁরা আমার উম্মতের নিকট হতে আমাকে সালাম পৌঁছে দেন।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

নবী ﷺ-এর উপর দরূদ এক বাঞ্ছনীয় কর্ম। বিশেষ করে জুমআর দিন তাঁর উপর দরূদ পাঠ করা উচিত। দরূদ নৈকট্যদানকারী শ্রেষ্ঠ আমলসমূহের অন্যতম। দুআর সময় দরূদকে অসীলা করাও বিধেয়, কারণ তা এক সৎকর্ম। সুতরাং আমরা দুআয় বলতে পারি যে, 'হে আল্লাহ! তোমার নবীর উপর আমার দরূদের অসীলায় আমার সঙ্কট দূর করে দাও---' ইত্যাদি। অসাল্লাল্লাহু আলা মুহাম্মাদ,অআলা আ-লিহী অসাল্লাম।

বিদআতী দরূদ

নবী ﷺ-এর উপর দরূদের বহু প্রকার বিদআতী (অভিনব) বাক্যসমষ্টি আমরা শুনে থাকি; যা রসূল, তাঁর সাহাবা, তাবেয়ীন এবং আয়েম্মায়ে মুজতাহেদীনদের উক্তিতে উল্লেখ হয়নি (যেমন চেহেল কাফ ও বিভিন্ন চিশ্তিয়া দরূদ)। বরং তা পরবর্তীকালের কিছু শায়খ ও বুযুর্গদের গড়া ও রচনা মাত্র।

কিন্তু দরূদের ঐ বিদআতী শব্দ-বিন্যাসগুলি সাধারণ মানুষ এবং উলামা (?) দের মাঝেও প্রচলিত হয়ে পড়েছে। রসূল ﷺ হতে বর্ণিত দরূদের চেয়ে ঐ সমস্ত বিদআতী দরূদই তারা অধিক অধিক পাঠ করে থাকে। আবার অনেকে বিশুদ্ধ বর্ণিত দরূদ ত্যাগ করে তাদের শায়খ ও পীরদের প্রতি সম্পৃক্ত দরূদই প্রচার ও প্রচলন করে থাকে। অথচ এই সমস্ত দরূদ নিয়ে আমরা যদি গভীর চিন্তা করে দেখি তাহলে আমরা দেখতে পাব যে, তাতে সেই রসূলের নির্দেশের পরিপন্থী বহু এমনও উক্তি রয়েছে যাঁর উপর আমরা দরূদ পাঠ করে থাকি। ঐ সমস্ত বিদআতী দরূদের কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১। "আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন তিব্বিল কুলূবি অ দাওয়া-ইহা, অ আ-ফিয়াতিল আবদা-নি অশিফা-ইহা, অনূরিল আবসা-রি অযিয়া-ইহা অ আলা আ-লিহি অসাল্লিম।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি করুণা বর্ষণ কর মুহাম্মাদের উপর, যিনি অন্তরের চিকিৎসা ও ঔষধ, শরীরের নিরাপত্তা ও আরোগ্য এবং চোখের জ্যোতি ও দীপ্তি, এবং তাঁর বংশধরের উপরেও (করুণা বর্ষণ কর) ও সকলের উপর শান্তি বর্ষণ কর।

এ কথা সর্বজনবিদিত যে, দেহ, হৃদয় ও চক্ষুর রোগ মুক্তিদাতা এবং নিরাপত্তাদানকারী একমাত্র আল্লাহ! রসূল তাঁর নিজের জন্য এবং অপরের জন্যও ইষ্ট-অনিষ্টের মালিক নন। সুতরাং দরূদের এই শব্দবিন্যাস আল্লাহ তাআলার এই বাণীর প্রতিকূল ঃ

( )

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার ভালো-মন্দের উপর আমার কোন অধিকার নেই।' *(সূরা ইউনূস ৪৯ আয়াত)*

আর তা নবী ﷺ-এর এই বাণীরও পরিপন্থী, "তোমরা আমার প্রশংসায় অতিরঞ্জন করো না যেমন খ্রিষ্টানরা মারয়্যাম-পুত্র (ঈসা)র প্রশংসায় করেছিল। আমি একজন দাস মাত্র। অতএব তোমরা আমাকে 'আল্লাহর বান্দা (দাস) ও তাঁর রসূলই' বল।" *(বুখারী)*

২। একজন লেবাননী সূফীপন্থী বড় শায়খের এক বই দেখেছি, তাতে দরূদের এই শব্দসমষ্টি সন্নিবিষ্ট হয়েছে ঃ

"আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিন হাত্তা তাজআলা মিনহুল আহাদিয়্যাতাল ক্বাইয়্যুমিয়্যাহ্।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যাতে তুমি তাঁকে একত্ব ও অবিনশ্বরতা দান কর।

অথচ একত্ব ও অবিনশ্বরতা কুরআনে বর্ণিত আল্লাহর গুণাবলীর অন্যতম। কিন্তু এই শায়খ তা রসূল ﷺ-এর জন্যও নির্ধারণ করেছেন।

৩। সিরিয়াবাসী জনৈক বড় শায়খের 'আদইয়াতুস সাবা-হি অল মাসা' নামক পুস্তকে এই দরূদ দেখেছি ঃ

"আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিল্লাযী খালাক্বতা মিন নূরিহী কুল্লা শাই।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের উপর অনুগ্রহ বর্ষণ কর, যার জ্যোতি হতে তুমি প্রত্যেক বস্তুকে সৃষ্টি করেছ।

এখানে 'প্রত্যেক বস্তু' বলতে আদম, ইবলীস, বানর, শূকর প্রভৃতিকে বুঝানো যায়। সুতরাং কোন জ্ঞানী বলবে কি যে, ওরা সবাই 'নূরে মুহাম্মাদী' (মুহাম্মাদের জ্যোতি) হতে সৃষ্ট?! পক্ষান্তরে শয়তানও জেনেছে যে, তাকে এবং আদমকে কি হতে সৃষ্টি করা হয়েছে। তাই তো সে আল্লাহকে বলেছিল; যেমন কুরআনে বর্ণিত ঃ

( )

অর্থাৎ, আমি ওর (আদম) থেকে শ্রেষ্ঠ। (কারণ) আপনি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছেন, আর ওকে সৃষ্টি করেছেন মাটি হতে। *(সূরা স্বাদ ৭৬ আয়াত)*

সুতরাং এই আয়াত শায়খের ওই দরূদকে মিথ্যা ও বাতিল বলে ঘোষণা করে।

৪। দরূদের বিদআতী শব্দবিন্যাসের একটি নিম্নরূপ ঃ-

"আসস্বালা-তু অসসালা-মু আলাইকা ইয়া রাসূলাল্লা-হ! যা-ক্বাত হীলাতী ফাআদ্রিক্নী ইয়া হাবীবাল্লা-হ!"

অর্থাৎ, আপনার উপর দরূদ ও সালাম হে আল্লাহর রসূল! আমি বেগতিক হয়ে পড়েছি, অতএব আমাকে রক্ষা করুন, হে আল্লাহর হাবীব!

এই দরূদের প্রথমাংশ সঠিক। কিন্তু আপদ ও শির্ক রয়েছে দ্বিতীয়াংশে যাতে বলা হয়েছে 'আদরিক্নী ইয়া হাবীবাল্লাহ!' যা আল্লাহর এই বাণীর পরিপন্থীঃ

( )

অর্থাৎ, আর্তের আর্তনাদে কে সাড়া দেয় যখন সে তাকে ডাকে এবং বিপদ দূরীভূত করে? (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কেউই নয়।) *(সূরা নাম্‌ল ৬২ আয়াত)*

তিনি আরো বলেন,

( )

অর্থাৎ, আর আল্লাহ যদি তোমাকে ক্লেশ দান করেন তবে তিনি ভিন্ন তার মোচনকারী আর কেউ নেই। *(সূরা আনআম ১৭ আয়াত)*

রসূল ﷺ যখন দুশ্চিন্তা বা দুর্দশাগ্রস্ত হতেন তখন বলতেন, "হে চিরঞ্জীব, হে অবিনশ্বর! আমি তোমার রহমতের অসীলায় সাহায্য প্রার্থনা করছি।" *(তিরমিযী)*

সুতরাং আমাদের জন্য কি করে বৈধ হতে পারে যে, আমরা তাঁকে 'রক্ষা করুন, পরিত্রাণ দিন' বলব?

আবার ঐ দরূদ তাঁর এই বাণীরও প্রতিকূল , "যখন কিছু চাইবে তখন আল্লাহরই নিকট চাও এবং যখন সাহায্য প্রার্থনা করবে তখন আল্লাহরই নিকট কর।" *(তিরমিযী, তিনি এটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।)*

৫। ফাতেহী দরূদ এবং তার শব্দগুলি নিম্নরূপ ঃ-

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিনিল ফা-তিহি লিমা উগলিক্ব----।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি প্রত্যেক বন্ধন-উন্মোচনকারী মুহাম্মদের উপর করুণা বর্ষণ কর।

আবার এর রচয়িতা মনে করে যে, উক্ত দরূদ পাঠ করা ৬ হাজার বার কুরআন তেলাওয়াত করা অপেক্ষাও উত্তম! এ কথা তিজানিয়াহ-পন্থীদের গুরু শায়খ আহমাদ তিজানী হতে কথিত।

নিঃসন্দেহে এটা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়। একথা কোন মুসলিম তো দূরের কথা-কোন জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিও বিশ্বাস রাখতে পারে না যে, এই বিদআতী দরূদ পড়া আল্লাহর বাণী ৬ হাজার তো বহু দূরের কথা -মাত্র একবার পড়া অপেক্ষাও উত্তম। সুতরাং এ কথা কোন মুসলিমের নয়।

পক্ষান্তরে রসূলকে সাধারণভাবে এবং আল্লাহর ইচ্ছার শর্ত আরোপ না করে হর-বন্ধন উন্মোচনকারী (বিজয়ী) বলে অভিহিত করাও মহাভুল। কারণ

রসূল ﷺ আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতিরেকে মক্কা জয় করেন নি। তদনুরূপ তিনি তাঁর পিতৃব্যের অন্তরকে আল্লাহর প্রতি ঈমান দ্বারা উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হননি। বরং তিনি শির্কের উপরেই মারা যান। কুরআন রসূলকে সম্বোধন করে বলে,

( )

অর্থাৎ, তুমি যাকে প্রিয় মনে কর তাকে সৎপথে আনতে পারবে না বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাকে সৎপথে আনয়ন করেন। *(সূরা ক্বাসাস ৫৬ আয়াত)*

আল্লাহ আরো বলেন, ( )

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি তোমার জন্য নিশ্চিত বিজয় অবধারিত করেছি। *(সূরা ফাত্‌হ ১ আয়াত)*

৬। 'দালায়েলু খাইরাত'-প্রণেতা সপ্তম হিযবে বলেন,

"আল্লা-হুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ, মা সাজাআতিল হামাইমু অ নাফাআতিত্ তামা-ইম।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের উপর করুণা বর্ষণ কর, যত কবুতর ডাকে এবং যত কবচ উপকৃত করে তার সমপরিমাণ!

বদনজর ইত্যাদি থেকে রক্ষার জন্য যে কবচ ও তাবীয বাচ্চাদের গলায় বা হাতে বাঁধা হয়, তা যে বাঁধে এবং যার জন্য বাঁধা হয় উভয়েরই কোন উপকার সাধন করে না। বরং কবচ ব্যবহার মুশরিকদের কর্ম।

রসূল ﷺ বলেন, "যে কবচ লটকায় সে শির্ক করে।" *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)* সুতরাং ঐ দরূদ এই হাদীসের পরিপন্থী। যেহেতু তা শির্ক ও কবচ বাঁধাকে আল্লাহর সামীপ্য লাভের মাধ্যম নিরূপণ করে! সুতরাং আমরা আল্লাহর নিকট নিরাপত্তা ও হেদায়াত প্রার্থনা করছি।

উক্ত পুস্তক 'দালায়েলুল খাইরাত' এ নিম্নের দরূদও বর্ণিত হয়েছে ঃ

"আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ, হাত্তা লা য়্যাবক্বা মিনাস সালা-তি শাই, অরহাম মুহাম্মাদা, হাত্তা লা য়্যাবক্বা মিনার রাহমাতি শাই!"

হে আল্লাহ! তুমি মুহাম্মাদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ কর -যাতে অনুগ্রহের কিছুও অবশিষ্ট না থাকে, এবং তুমি মুহাম্মাদের প্রতি করুণা কর, যাতে করুণার কিছুও অবশিষ্ট না থাকে!

অনুগ্রহ ও করুণা (সালাত ও রহমত) আল্লাহর ক্রিয়াগত গুণ। কিন্তু এই দরূদে তা নিঃশেষ ও অবসান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ ওদের এই কথার খন্ডন করে বলেন,

)

(

অর্থাৎ- বল, 'আমার প্রতিপালকের বাণী (গুণাবলী) লিপিবদ্ধ করার জন্য যদি সমুদ্র কালি হয় তবে আমার প্রতিপালকের বাণী (গুণাবলী) শেষ হওয়ার পূর্বেই সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে যদিও অনুরূপ অতিরিক্ত আরো কালি আনয়ন করা হয়।' *(সূরা কাহফ ১০৯ আয়াত)*

৭। বাশীশী দরূদ। ইবনে বাশীশ ঐ দরূদে বলেন,

"আল্লাহুম্মান শুলনী মিন আওহা-লিত্ তাওহীদ, অআগ্‌রিক্বনী ফী আইনি বাহরিল অহ্‌দাহ। অযুজ্জা বী ফিল আহাদিয়্যাতি হাত্তা লা আরা অলা আসমাআ অলা আহুস্‌সা ইল্লা বিহা!"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে তওহীদের কর্দম থেকে সত্বর বাহির করে নাও এবং অদ্বৈতের সিন্ধু-প্রস্রবনে আমাকে নিমজ্জিত কর ও অদ্বৈতে আমাকে নিক্ষিপ্ত কর। যাতে আমি তার দ্বারাতেই দর্শন, শ্রবণ এবং অনুভব করি।

বলাই বাহুল্য যে, উক্ত মতবাদ সর্বেশ্বরবাদীদের; যারা স্রষ্টা ও সৃষ্টিকে অভিন্ন মনে করে। বক্তার মতে তওহীদে কাদা ও ময়লা আছে, তাই সে দুআ করছে যাতে তাকে সেখান হতে বের করে নিয়ে অভিন্নতা ও অদ্বৈতের সমুদ্রে নিমজ্জিত করা হয় এবং এখানে সে প্রত্যেক বস্তুতে তার মা'বুদকে দেখতে পায়। তাই তো ওদের গুরু বলে,

'কুকুর ও শূকর আমাদের উপাস্য বই অন্য কিছু নয়
গির্জায় সন্ন্যাসীই তো আল্লাহ !'

সুতরাং খ্রিষ্টানরা ঈসাকে আল্লাহর পুত্র মেনে মুশরিক হল। কিন্তু ওরা সারা সৃষ্টিকে আল্লাহর শরীক করে বসল!! মুশরিকরা যা বলে তা হতে আল্লাহ কত উর্ধ্বে!

৮। অতএব হে ভাই মুসলিম! এ সমস্ত (এবং এই ধরনের যাবতীয়) দরূদ হতে সাবধান হন; যা আপনাকে শির্কে আপতিত করে। বরং আপনি রসূল ﷺ কর্তৃক বর্ণিত ও নির্দেশিত দরূদেই সীমাবদ্ধ থাকুন; যে রসূল নিজের মন থেকে কিছু বলেন না, যাঁর অনুসরণে সৎপথ ও পরিত্রাণ রয়েছে এবং যাঁর বিরুদ্ধাচরণ ও অন্যথাচরণে আমল ও কর্ম (আল্লাহর নিকট) প্রত্যাখ্যাত হয়ে যায়। তিনি (সঃ) বলেন, "যে ব্যক্তি এমন আমল করে যার উপর আমাদের কোন নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।" *(মুসলিম)*

দরূদে না-রী

'না-রী' দরূদ (বা দরূদে না-রিয়াহ) বহু লোকের নিকট পরিচিত। ওরা মনে করে যে, যে ব্যক্তি ঐ দরূদ ৪৪৪৪ বার বিপদ দূরীকরণের উদ্দেশ্যে পড়বে তার বিপদ দূর হবে এবং কোন প্রয়োজন মিটাবার উদ্দেশ্যে পড়লে তা পূর্ণ হবে। অথচ এটা এক ভ্রান্ত ধারণা, যার কোন দলীল নেই। বিশেষ করে যখন আপনি ওর শব্দাবলী জানবেন তখন ওতে স্পষ্টভাবে শির্ক লক্ষ্য করবেন। ঐ দরূদ নিম্নরূপ ঃ-

"আল্লাহুম্মা স্বাল্লি স্বালা-তান কা-মিলাতাঁও অসালা-মান তা-ম্মান আলা সাইয়্যিদিনা মুহাম্মাদিনিল্লাযী তানহাল্লু বিহিল উক্বাদ, অতানফারিজু বিহিল কুরাব, অতুক্বযা বিহিল হাওয়াইজ, অতুনা-লো বিহির রাগা-ইবু অহুসনুল খাওয়াতীম, অয়্যুসতাস্কাল গামা-মু বিঅজহিহিল কারীম, অআলা আ-লিহী অসাহবিহি আদাদা কুল্লি মা'লূমিন লাক্।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! পরিপূর্ণ অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর আমাদের সর্দার মুহাম্মাদের উপর; যাঁর অসীলায় সমস্ত বাঁধন খুলে যায়, সমস্ত সঙ্কট দূরীভূত হয়, সকল প্রয়োজন পূর্ণ হয়, অভীষ্ট ও শুভ পরিণাম লাভ হয় এবং যাঁর সম্মানিত চেহারার অসীলায় বৃষ্টি প্রার্থনা করা হয়। আর (পরিপূর্ণ অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর) তাঁর বংশধর ও সাহাবার উপর তোমার জানা বস্তুর সংখ্যা পরিমাণ।

১। তওহীদের আকীদা (বিশ্বাস); যার প্রতি কুরআন আমাদেরকে আহবান করেছে, যা রসূল ﷺ শিক্ষা দিয়েছেন এবং প্রত্যেক মুসলিমের জন্য যা বিশ্বাস করা অত্যাবশ্যক তা হল এই যে, একমাত্র আল্লাহ্ই বন্ধনমুক্ত করেন, প্রয়োজন পূর্ণ করেন এবং প্রার্থনার সময় মানুষ তাঁর নিকট যা চায় তা তিনিই দান করে থাকেন। কোন মুসলিমের জন্য সঙ্কট দূরীকরণ অথবা রোগ-নিরাময় প্রভৃতির উদ্দেশ্যে গায়রুল্লাহকে ডাকা বা তার নিকট প্রার্থনা করা বৈধ নয় - যদিও (যার নিকট প্রার্থনা করা হয়) সেই গায়রুল্লাহ আল্লাহর সন্নিহিত কোন ফিরিশ্তা অথবা প্রেরিত কোন নবী হন। কুরআন কারীম আম্বিয়া, আওলিয়া প্রভৃতি গায়রুল্লাহকে আহবান করার কথা খন্ডন করে বলে,

)

(

অর্থাৎ, বল, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে উপাস্য মনে কর তাদেরকে আহবান কর; (করলে দেখবে) তোমাদের দুঃখ-দৈন্য দূর করার অথবা পরিবর্তন করার শক্তি ওদের নেই। ঐ উপাস্যরাই যাদেরকে ওরা আহবান করে তাদের মধ্যে যারা নিকটতর তারাই তো তাদের প্রতিপালকের নৈকট্যলাভের উপায় সন্ধান করে, তাঁর দয়ার প্রত্যাশা করে ও তাঁর আযাবকে ভয় করে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালকের আযাব ভয়াবহ। *(সূরা ইসরা ৫৬-৫৭ আয়াত)*

মুফাস্সিরগণ বলেন, উক্ত আয়াতটি এক সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে অবতীর্ণ হয়; যারা ঈসা অথবা ফিরিশ্তা অথবা নেক জিনদেরকে বিপদে আহবান করত বা তাদের নিকট প্রার্থনা করত। *(ইবনে কাসীর একথা উল্লেখ করেছেন।)*

২। আল্লাহর রসূল ﷺ কিরূপে সম্মত হতে পারেন যে, তাঁর প্রসঙ্গে বলা হবে, 'তিনি বন্ধন মুক্ত করেন ও বিপদ দূর করেন।' অথচ কুরআন তাঁকে আদেশ করে ও বলে,

(

অর্থাৎ- বল, 'আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভালো মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি গায়েব (অদৃশ্যের খবর) জানতাম, তবে তো প্রভূত কল্যাণ লাভ করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করত না। আমি তো মুমিন সম্প্রদায়ের জন্য সতর্ককারী ও সুসংবাদবাহী মাত্র।' *(সূরা আ'রাফ ১৮৮ আয়াত)*

এক ব্যক্তি রসূল ﷺ-এর নিকট এসে তাঁকে বলল, 'আল্লাহ ও আপনার ইচ্ছা।' তিনি বললেন, "তুমি কি আমাকে আল্লাহর শরীক (ও সমকক্ষ) করে ফেললে? বল, 'একমাত্র আল্লাহরই ইচ্ছা।" *(নাসায়ী এটিকে হাসান সনদে বর্ণনা করেছেন।)*

৩। উক্ত দরূদে "বিহি" শব্দের স্থলে যদি "বিহা" শব্দ ব্যবহার করা হয় তাহলে তার অর্থ সঠিক ও শির্কহীন হবে। অবশ্য উল্লিখিত সংখ্যা (৪৪৪৪) দ্বারা নির্দিষ্ট করা হবে না। সুতরাং বলতে হবে, "আল্লা-হুম্মা সাল্লি স্বালা-তান কা-মেলাতাঁও অসাল্লিম সালা-মান তা-ম্মান আলা সাইয়িদিনা মুহাম্মাদ, আল্লাতী তুহাল্লু বিহাল উক্বাদ---।"

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! তুমি পরিপূর্ণ অনুগ্রহ ও শান্তি বর্ষণ কর আমাদের সর্দার মুহাম্মাদের উপর যে অনুগ্রহ (দরূদ)এর অসীলায় বন্ধন মুক্ত করা হয়---।

যেহেতু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লামের উপর দরূদ পড়া এক ইবাদত; যাকে দুশ্চিন্তা ও সঙ্কট দূর করার জন্য অসীলা করে দুআ করা যায়।

৪। পরিশেষে বলি যে, আমরা কেন এসব সাধরণ মানুষের রচিত ও গড়া বিদআতী দরূদ পাঠ করব এবং ক্রটিহীন রসূলের মুখ-নিঃসৃত ইব্রাহীমী দরূদ পরিত্যাগ করব?

কুরআন জীবিতদের জন্য, মৃতদের জন্য নয়

আল্লাহ তাআলা বলেন,

(

অর্থাৎ, আমি এ কল্যাণময় গ্রন্থ তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ উপদেশ গ্রহণ করে। *(সূরা স্বাদ ২৯ আয়াত)*

সাহাবাগণ কুরআনের নির্দেশ পালন এবং তার নিষেধ বর্জন করার উপর প্রতিযোগিতা করেছেন। যার ফলে তাঁরা ইহ-পরকালের জন্য পরমসুখী ও সৌভাগ্যবান ছিলেন। মুসলিমরা যখন কুরআনের নির্দেশাবলী ত্যাগ করে বসল এবং কেবল মওতাদের উদ্দেশ্যে, কবরের উপর এবং মৃত্যুর পর কয়েকদিন (আত্মীয়-স্বজনদের সাক্ষাতের কয়েকদিন) পাঠ করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখল তখন তাদের মধ্যে লাঞ্ছনা ও বিচ্ছিন্নতা অবতীর্ণ হল। আল্লাহ তাআলার এই বাণী তাদের বাস্তব পরিস্থিতি বর্ণনা করে বলে,

( )

অর্থাৎ, এবং রসূল বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার সম্প্রদায় তো এ কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছে।' *(সূরা ফুরক্বান ৩০ আয়াত)*

আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন জীবিত মানুষদের জন্য, যাতে তারা তাদের জীবনকে তার নির্দেশানুসারে পরিচালিত করে। সুতরাং কুরআন মৃত মানুষদের জন্য কোন উপকারী বস্তু নয়। যেহেতু তাদের আমল ও কর্ম তো বন্ধ হয়ে গেছে, তাই তারা তা পড়তে (ও শুনতেও) পারে না এবং সে অনুসারে কর্মও করতে পারে না। আর তাদের নিকট কুরআন পাঠের সওয়াবও পৌঁছে না। অবশ্য আপন ছেলের নিকট হতে সওয়াব তাদের নিকট পৌঁছে থাকে কারণ ছেলে বাপের স্বকর্ম (ও প্রতিপালনের) ফল। রসূল ﷺ বলেন, "মানুষ মারা গেলে তিনটি বিষয় ছাড়া তার আমল বন্ধ হয়ে যায়; সাদকাহ জারিয়াহ (ইষ্টাপূর্ত কর্ম) তার ফলপ্রসূ ইলম এবং সৎসন্তান যে তার জন্য দুআ করে।" *(মুসলিম)*

আল্লাহ তাআলা বলেন, ( )

অর্থাৎ, এবং মানুষ তাই পায় যা সে নিজে করে। *(সূরা নাজম ৩৯ আয়াত)*

ইবনে কাসীর অত্র আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, 'যেমন মানুষ অন্যের পাপ বহন করবে না তেমনি সে সেই পুণ্যও লাভ করবে না; যা সে নিজের জন্য স্বয়ং অর্জন করেনি। এই আয়াতে কারীমাহ থেকেই ইমাম শাফেয়ী উদ্ভাবন করেন

যে, কুরআন পাঠের উৎসর্গীকৃত পুণ্য মৃতদের নিকট পৌছেনা। যেহেতু তা তাদের (মওতাদের) নিজস্ব আমল বা উপার্জন নয়। এই জন্যই রসূল ﷺ তাঁর উম্মতকে এ বিষয়ে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করেননি এবং স্পষ্টভাবে অথবা ইঙ্গিতেও কোন নির্দেশ দেননি। আর কোন সাহাবী হতেও এর বৈধতা বর্ণিত হয়নি। যদি তাতে কল্যাণ থাকত তাহলে নিশ্চয় তাঁরাই সর্বাগ্রে তা করে যেতেন।

পক্ষান্তরে আল্লাহর সামীপ্যদাতা ইবাদতের ব্যাপারটা শরীয়তের স্পষ্ট উক্তির উপরই সীমাবদ্ধ। এতে নানা প্রকার কিয়াস (অনুমিতি) ও রায়ের চাকা অচল। অবশ্য দুআ ও সাদ্‌কাহ মৃতের নিকট পৌছনোর কথা সর্ববাদিসম্মত এবং এ বিষয়ে শরীয়তেরও স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে।'

১। মুর্দার নামে 'কুরআন খানীর' প্রথা এত ব্যাপক প্রচলিত যে, কুরআন তেলাঅত মরণের নিদর্শন ও চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বেতার-কেন্দ্র থেকে একটানা কুরআন পাঠ শুনতেই পাওয়া যায় না, আর যদি কোন দিন অবিরাম তেলাঅত শুনেন তাহলে জানবেন যে, কোন রাষ্ট্রনায়ক মারা গেছেন। যদি কোন বাড়ি হতে তেলাঅতের শব্দ শুনেন তাহলে জানবেন যে, ঐ বাড়িতে কারো মৃত্যুশোক পালিত হচ্ছে।

একদা এক রোগাগ্রস্ত শিশুর উপর (ঝাড়ার জন্য) জনৈক সাক্ষাৎকারী কুরআন পাঠ করতে লাগলে তার মা চিৎকার করে বলে উঠল, 'আমার ছেলে মারা তো যায়নি, আপনি ওর উপর কুরআন পড়েন কেন?!'

এক মহিলা রেডিও থেকে সূরা ফাতিহা শুনে বলল, 'আমি সূরাটিকে পছন্দ করি না, কারণ তা আমার মৃত ভাইকে স্মরণ করিয়ে দেয়; যেহেতু ঐ সূরা তার উপর পড়া হয়েছিল!' (এ সবের কারণ হল, মানুষ মৃত্যু ও তার আনুষঙ্গিক বিষয়কে অপছন্দ করে।)

২। যে মৃতব্যক্তি তার জীবনকালে নামায ত্যাগ করেছে সে মৃত্যুর পর কুরআন দ্বারা কিরূপে উপকৃত হতে পারে? অথচ কুরআন তাকে সর্বনাশ ও আযাবের শুভসংবাদ (?) দেয়,

( )

অর্থাৎ, সুতরাং দুর্ভোগ সেই নামাযীদের যারা তাদের নামায সম্বন্ধে উদাসীন। *(সূরা মাউন ৪-৫ আয়াত)*

আর এ দুর্ভোগ তো তার, যে নামায ত্যাগ করে না; কিন্তু তা যথাসময় হতে ঢিলে করে (আদায় করে। তাহলে বেনামাযীর দুর্ভোগ কত তা অনুমেয়।)

৩। "তোমরা তোমাদের মৃত (মরণোম্মুখ) ব্যক্তিদের উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ কর।" এই হাদীসটিকে ইবনুল কাত্তান বিশৃঙ্খল, সাহাবীর উক্তি এবং অজ্ঞাত-পরিচয় হওয়ার কারণে দুর্বল বলে চিহ্নিত করেছেন। দারাকুত্বনী বলেছেন, 'হাদীসটি বর্ণনা সূত্রের দিক হতে বিশৃঙ্খল ও মূল উক্তির দিক হতে অজ্ঞাত-পরিচয় এবং অশুদ্ধ।'

রসূল ﷺ এবং তাঁর সাহাবা কর্তৃকও একথা প্রমাণিত নেই যে, তারা কোন মুর্দার উপর সূরা ইয়াসীন, ফাতেহা বা কুরআনের অন্য কোন সূরা পাঠ করেছেন। বরং মৃতব্যক্তির দাফনকার্য সমাধা করার পর রসূল ﷺ সাহাবাবৃন্দকে বলতেন, "তোমরা তোমাদের ভায়ের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার জন্য প্রতিষ্ঠিত থাকার ক্ষমতা চাও। কারণ ওকে এক্ষনি প্রশ্ন করা হবে।" *(সহীহ, আবুদাউদ প্রমুখ)*

৪। দ্বীনের আহবায়ক জনৈক আলেম বলেন, 'ধিক্ তোমার প্রতি, হে মুসলিম! তোমার জীবন থাকতে তুমি কুরআনকে ত্যাগ করলে ও তার নির্দেশ অনুযায়ী কর্ম তো করলে না। অবশেষে যখন তোমার মৃত্যুর সময় হল, তখন লোকেরা তোমার উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করল -যাতে তোমার সহজে জীবন যায়! তাহলে কুরআন তোমার জীবনের জন্য অবতীর্ণ হয়েছে নাকি তোমার মরণের জন্য?!'

৫। কবরস্থানে প্রবেশের সময় সূরা ফাতেহা (বা অন্য সূরা) পড়তে হয় - এ কথা রসূল ﷺ সাহাবাকে শিখান নি, বরং তাঁদেরকে এই দুআ পড়তে শিখিয়েছেন,

"আসসালামু আলাইকুম আহলাদ্ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীন। অইন্না ইনশা-আল্লাহু বিকুম লালা-হিকূন। আস্আলুল্লা-হা লানা অলাকুমুল আ-ফিয়াহ।"

অর্থাৎ, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ হোক, হে কবরবাসী মুমিনগণ! আল্লাহ চাইলে আমরা তোমাদের সহিত মিলিত হব। আমি আমাদের এবং তোমাদের জন্য (আযাব হতে) নিরাপত্তা কামনা করি।” *(মুসলিম)*

অতএব উক্ত হাদীস আমাদেরকে শিখায় যে, আমরা মৃতব্যক্তিগণের জন্যই দুআ করব, না তাদের নিকট আমরা দুআ করব এবং সাহায্য প্রার্থনা করব।

৬। কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে যাতে জীবিত মানুষদের উপর পঠিত হয়, যারা তা শ্রবণ করে (বুঝে) আমল করতে (বা নেকী অর্জন করতে) সক্ষম। আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, (এ তো এক উপদেশ ও সুস্পষ্ট কুরআন;) যাতে (রসূল দ্বারা) জীবিত ব্যক্তিকে সতর্ক করতে পারে এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সাব্যস্ত হয়। *(সূরা ইয়াসীন ৭০আয়াত)*

কিন্তু মৃতরা তা শুনতেই পায় না এবং তারা এর দ্বারা আমল করবে তাও অসম্ভব।

হে আল্লাহ! রসূল ﷺ-এর পদ্ধতি-অনুসারে আমাদেরকে কুরআন অনুযায়ী কর্ম করার প্রেরণা ও শক্তি দান কর। (আমীন)।

নিষিদ্ধ কিয়াম (প্রত্যুত্থান)

প্রিয় রসূল ﷺ বলেন, “যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, লোক তার জন্য দন্ডায়মান হোক সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।” *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

আনাস ؓ বলেন, ‘তাঁদের (সাহাবাদের) নিকট রসূল ﷺ অপেক্ষা অন্য কেউই প্রিয়তম ছিল না। তা সত্ত্বেও তাঁরা যখন তাঁকে দেখতেন তখন তাঁর জন্য উঠে দাঁড়াতেন না। যেহেতু তাঁরা জানতেন যে, তিনি তা অপছন্দ করেন।” *(সহীহ, তিরমিযী)*

১। উক্ত হাদীসদ্বয় হতে বুঝা যায় যে, যে ব্যক্তি কোন মজলিসে প্রবেশের সময় তার জন্য লোকেরা প্রত্যুত্থান করুক একথা পছন্দ ও কামনা করে সে

জাহান্নাম প্রবেশের সম্মুখীন হয়। সাহাবা ﷺ রসূল ﷺ-কে অতিশয় ভালোবাসতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁরা তাঁকে দেখলে উঠে দন্ডায়মান হতেন না। কারণ তাঁর জন্য উঠে দন্ডায়মান হওয়া তাঁর নিকট যে অপছন্দনীয় তা তাঁরা জানতেন।

২। লোকেরা কিছু ব্যক্তিবর্গের জন্য উঠে দন্ডায়মান হওয়াটাকে অভ্যাস বানিয়ে নিয়েছে, বিশেষ করে শায়খ যখন দর্স দেবার জন্য অথবা কোন স্থান যিয়ারতের জন্য প্রবেশ করেন, তদনুরূপ শিক্ষক যখন ক্লাসরুমে প্রবেশ করেন, তখন দেখা মাত্রই ছাত্রবৃন্দ তাঁর সম্মানার্থে উঠে দন্ডায়মান হয়। আর এদের মধ্যে যদি কেউ খাড়া হতে না-ই চায়, তাহলে শিক্ষক ও গুরুর প্রতি তার বেআদবী ও অসম্মান দরুন তাকে তিরস্কার ও ভর্ৎসনা করা হয়।

শায়খ ও শিক্ষকের সম্মানার্থে প্রত্যুত্থানের উপর তাঁদের নীরবতা এবং প্রত্যুত্থান করতে অসম্মত ছাত্রকে তিরস্কার করা এ কথারই দলীল যে, তাঁরা ঐ প্রত্যুত্থান ও দন্ডায়মান হওয়াকে মনে মনে পছন্দ করেন ও চান। যার ফলে তাঁরা নিজেদেরকে জাহান্নামের সম্মুখীন করে তুলেন।

পক্ষান্তরে যদি তাঁরা ঐ আদব পছন্দ না করতেন অথবা নিন্দনীয় জানতেন তাহলে নিশ্চয় তাঁরা তাঁদের ছাত্রদেরকে তা শিক্ষা দিতেন এবং তার পর হতে তাঁদের জন্য আর প্রত্যুত্থান না করতেই আদেশ দিতেন ও দন্ডায়মান হতে নিষেধকারী হাদীসসমূহ তাদের সামনে ব্যাখ্যা করতেন।

আলেম অথবা প্রবেশকারীর জন্য পুনঃপুনঃ উঠে দাঁড়ানো উভয়ের অন্তরে ঐ অভ্যাসের প্রেম সৃষ্টি করে ফেলে। ফলে যদি তার জন্য কেউ খাড়া না হয়, তাহলে মনে যেন কেমন ক্ষুন্নতা অনুভব করে। আর ঐ প্রত্যুত্থানকারীরা আগন্তুকের জন্য প্রত্যুত্থান-প্রেমের উপর শয়তানের সহায়ক হয়। অথচ নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের ভায়ের বিরুদ্ধে শয়তানের সহযোগী হয়ো না।" *(বুখারী)*

৩। বহু লোক বলে থাকে, 'আমরা শায়খ বা শিক্ষকের জন্য দন্ডায়মান হই তাঁদের ইল্মের সম্মানার্থে।' কিন্তু আমরা তাদেরকে বলব যে, তোমরা কি রসূল ﷺ-এর ইলম ও তাঁর প্রতি সাহাবাবর্গের আদব ও সম্মান প্রদর্শনে সন্দেহ পোষণ কর? কই তা সত্ত্বেও তাঁরা তো তাঁর জন্য দন্ডায়মান হননি। পরন্তু ইসলাম প্রত্যুত্থান ও কিয়াম দ্বারা সম্মান প্রদর্শন গণ্য করেনি। সম্মান

তো আনুগত্য, আজ্ঞাপালন, সালাম (অভিবাদন) ও মুসাফা (করমর্দন) এর মাধ্যমে প্রকাশ পায়।

এ বিষয়ে কবি শওকীর কথা স্বীকার্য নয় ঃ

'উঠে দন্ডায়মান হও শিক্ষকের জন্য
ও তাঁর পরিপূর্ণ সম্মান প্রদর্শন কর,
কারণ শিক্ষক প্রায় রসূল হওয়ার কাছাকাছি!'

যেহেতু এ কথা বিচ্যুতিহীন রসূল ﷺ-এর বাণীর পরিপন্থী, যিনি দন্ডায়মান হওয়াকে অপছন্দ করেছেন। আর যে ব্যক্তি তা পছন্দ করে, সে পছন্দ তার জাহান্নাম যাবার কারণ হবে।

৪। কোন কোন মজলিসে অবস্থান করে অধিকাংশ লক্ষ্য করেছি, সেখানে একজন ধনবান প্রবেশ করলে তার জন্য লোকেরা প্রত্যুত্থান করে। কিন্তু পরক্ষণেই কোন দরিদ্র প্রবেশ করলে তার জন্য কেউ উঠে দাঁড়ায় না। এই দ্বিমুখো ব্যবহারের ফলে দরিদ্রের মনে ধনী এবং মজলিসে উপবিষ্ট সকল মানুষের প্রতি বিদ্বেষ ও ঘৃণা সৃষ্টি হয়। পরিশেষে মুসলিম সমাজে পরস্পরের প্রতি ঈর্ষা-দ্বেষ ও ঘৃণা অবস্থায়ী হয়ে যায়; যা হতে ইসলাম নিষেধ করেছে। আর এর মূল কারণ হয় ঐ কিয়াম বা প্রত্যুত্থান।

পক্ষান্তরে যার জন্য লোকে উঠে দাঁড়ায় না সেই দরিদ্র ঐ ধনী অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হতে পারে, যার সম্মানার্থে লোকে উঠে দাঁড়িয়ে থাকে। যেহেতু আল্লাহ বলেন,

( )

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে অধিক পরহেযগার (সংযমী) ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন। *(সূরা হুজরাত ১৩ আয়াত)*

৫। হয়তো কেউ বলতে পারে যে, 'যদি আমরা আগন্তুকের জন্য খাড়া না হই, তাহলে সম্ভবতঃ সে উপবিষ্ট ব্যক্তিদের প্রতি মনে মনে ক্ষুন্ন হবে। (তাই তার মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে দাঁড়াতে হয়)।'

কিন্তু আমরা তাকে বলব, ঐ আগন্তুকের জন্য আমরা ব্যাখ্যা করব যে, তার প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম আমাদের অন্তরে বিদ্যমান। (কিন্তু তা প্রত্যুত্থান দ্বারা আমরা প্রকাশ করতে পারি না।) কারণ আমরা এ বিষয়ে (এবং সর্ববিষয়ে) রসূল ﷺএর অনুকরণ করি, যিনি নিজের জন্য প্রত্যুত্থান (কারো উঠে দাঁড়ানোকে)

অপছন্দ করতেন এবং তাঁর সাহাবাবর্গেরও অনুসরণ করি, যাঁরা তাঁর উদ্দেশ্যে প্রত্যুত্থান করতেন না। আর আমরা আগন্তুকের জন্য জাহান্নাম প্রবেশকেও অপছন্দ করি।

৬। কিছু ওলামাদের হয়তো বলতে শুনবেন যে, রসূলের কবি হাস্‌সান বলেছিলেন, "প্রিয়তমের উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হওয়া আমার জন্য ফরয।" তো একথা সঠিক ও শুদ্ধ নয়।

ইবনে বাত্তাহ হাম্বলীর ছাত্র কি সুন্দরই না বলেছেন,

"আমাদের অন্তঃকরণ যদি বিশুদ্ধ হয়
দেহকে কষ্ট না দিয়ে, তবে তাই যথেষ্ট।
তোমার ভাইকে এমন অভ্যর্থনা করার ভার দিওনা
যাতে সে তোমার জন্য অবৈধ কর্মকে বৈধ করে ফেলে।
আমরা প্রত্যেকেই নিজ সুহৃদের প্রীতিতে আস্থাবান্
তবে আবার আমাদের ক্ষোভ ও দুঃখ কিসে?"

বিধেয় ও বাঞ্ছিত (কিয়াম) প্রত্যুত্থান

কিছু সহীহ হাদীস এবং সাহাবাগণের আমল আগন্তুকের প্রতি উঠে দন্ডায়মান হতে নির্দেশ করে। আসুন! আমরা সেই হাদীসগুলিকে বুঝি ঃ-

১। রসূল ﷺ-এর কন্যা ফাতেমা তাঁর নিকট এলে তিনি তাঁর প্রতি এবং তিনি ফাতেমার নিকট এলে তিনিও পিতার প্রতি উঠে দন্ডায়মান হতেন। যেহেতু তা হল মেহেমানের সাক্ষাৎ ও খাতিরের উদ্দেশ্যে তার প্রতি উঠে দন্ডায়মান হওয়া। রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও পরকালে ঈমান রাখে সে যেন তার মেহেমানের খাতির করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

কিন্তু এই উদ্দেশ্যে কেবল মেজবান (আপ্যায়নকারী গৃহস্থ)ই উঠে দন্ডায়মান হবে।

২। “তোমরা তোমাদের সর্দারের প্রতি উঠ।” *(বুখারী ও মুসলিম)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, “--- এবং ওকে (সওয়ারী) হতে নামাও।”

এই হাদীসের পটভূমিকা এই যে, (খন্দকের যুদ্ধ শেষে) সা’দ ﷺ আহত ছিলেন। ইয়াহুদীদের ব্যাপারে বিচার করার উদ্দেশ্যে রসূল ﷺ তাঁকে আহূত করেন। তাই তিনি এক গর্দভের পৃষ্ঠে আরোহণ করে যখন তাঁর নিকট পৌঁছলেন তখন রসূল ﷺ আনসারকে লক্ষ্য করে বললেন, “তোমরা তোমাদের সর্দারের প্রতি উঠ এবং ওঁকে নামাও।” সুতরাং (কিছু) সাহাবা উঠে গিয়ে তাঁকে গর্দভ থেকে নামালেন। এই দন্ডায়মান আনসারের সর্দার সা’দ ﷺএর সাহায্যার্থে বাঞ্ছনীয় ছিল। কারণ তিনি গর্দভের পৃষ্ঠে আহতাবস্থায় বসে ছিলেন; যাতে (নামতে গিয়ে) পড়ে না যান। পক্ষান্তরে রসূল ﷺ এবং অবশিষ্ট সাহাবাবৃন্দ উঠে দন্ডায়মান হননি।

৩। বর্ণিত যে, সাহাবী কা’ব বিন মালেক যখন মসজিদে প্রবেশ করলেন তখন সাহাবাগণ উপবিষ্ট ছিলেন। জিহাদে অংশ গ্রহণ না করার পর তাঁর তওবা কবুল হওয়ার শুভসংবাদ নিয়ে তালহা তাঁর প্রতি উঠে ছুটে পৌঁছলেন। সুতরাং কোন দুঃখিত ব্যক্তির অন্তরে আনন্দ আনয়ন এবং আল্লাহর তরফ থেকে তার তওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ দান করার উদ্দেশ্যে উঠে দন্ডায়মান হয়ে তার নিকট যাওয়া বৈধ ছিল।

৪। সফর হতে আগন্তুক ব্যক্তির সহিত মুআনাকা (কোলাকুলি) করার উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হওয়া বৈধ।

৫। আমরা লক্ষ্য করেছি যে, উক্ত হাদীসগুলির প্রত্যেকটিতে ‘তোমাদের সর্দারের প্রতি, তালহার প্রতি, ফাতেমার প্রতি--’ ইত্যাদি শব্দ ব্যবহার হয়েছে এই হাদীসসমূহ (আগন্তকের প্রতি) উঠে দন্ডায়মান হওয়ার বৈধতা প্রমাণ করে। পক্ষান্তরে দন্ডায়মান হতে নিষেধকারী হাদীসগুলিতে ‘ ’ (তার জন্য বা উদ্দেশ্যে দন্ডায়মান হওয়া) শব্দ ব্যবহার হয়েছে। আর ‘ ’ (তার প্রতি উঠা, অর্থাৎ তার সাহায্য ও খাতিরার্থে তার নিকট সত্বর উঠে যাওয়া) এবং ‘ ’ (তার জন্য বা উদ্দেশ্যে উঠা, অর্থাৎ তার তা’যীম ও সম্মানার্থে স্বস্থানে উঠে দন্ডায়মান হওয়া)র মাঝে বিরাট পার্থক্য।

দুর্বল ও জাল হাদীস

রসূল ﷺ-এর প্রতি সম্বদ্ধ (তাঁর নিকট হতে বর্ণিত) হাদীস সমুদয়ের কিছু তো সহীহ ও হাসান এবং কিছু দুর্বল ও জাল। ইমাম মুসলিম তাঁর কিতাব (সহীহ মুসলিম)এর ভূমিকায় যা উল্লেখ করেছেন তাতে যয়ীফ ও দুর্বল হাদীস ব্যবহার করতে সাবধান করা হয়েছে। তিনি বলেন, "প্রত্যেক শ্রুত হাদীস বর্ণনা করা নিষিদ্ধ হওয়ার পরিচ্ছেদ।" আর এর দলীল স্বরূপ এই হাদীস উল্লেখ করেন,

নবী ﷺ বলেন, "মানুষের মিথ্যা বলার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শোনে তাই বর্ণনা করে।"

ইমাম নওবী সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা-গ্রন্থে উল্লেখ করেন, "দুর্বল বর্ণনাকারীদের নিকট হতে হাদীস বর্ণনা নিষিদ্ধ হওয়ার পরিচ্ছেদ।" এতে তিনি নবী ﷺ-এর এই বাণীকে দলীল স্বরূপ পেশ করেন ঃ

"শেষ যুগে আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতক লোক হবে যারা তোমাদেরকে সেই হাদীস বর্ণনা করবে যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরাও শ্রবণ করেনি সুতরাং তোমরা তাদের হতে সাবধান থেকো।" *(মুসলিম)*

ইমাম ইবনে হিব্বান তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে বলেন, 'যে ব্যক্তি বিশুদ্ধতা ও সঠিকতা না জেনে কোন কিছু মুস্তফা ﷺ-এর প্রতি সম্বন্ধ করে, তার জন্য জাহান্নাম প্রবেশ অনিবার্য -এই উপস্থাপনার অধ্যায়।' অতঃপর তাঁর নিজ বর্ণনাসূত্র দ্বারা রসূল ﷺ-এর এই বাণী উল্লেখ করেন ঃ

"যে ব্যক্তি আমি যা বলিনি তা আমার নামে বলবে, সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে করে নেয়।" *(হাসান, মুসনাদে আহমদ)*

জাল ও গড়া হাদীস থেকেও রসূল ﷺ সতর্ক করেছেন; তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি আমার নামে ইচ্ছাকৃত মিথ্যা বলে সে যেন নিজের বাসস্থান জাহান্নামে বানিয়ে নেয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বহু উলামা ও বুযুর্গদেরকে তাঁদের মযহাব ও বিশ্বাসের সমর্থনে ঐ (জাল ও গড়া) হাদীস উল্লেখ করতে দেখা যায়।

শত-সহস্র জাল হাদীসের একটি হাদীস 'আমার উম্মতের মতবিরোধিতা এক কৃপা (আপোসের ইখতিলাফ রহমত!)' আল্লামা ইবনে হায্‌ম বলেন, 'এটা হাদীস নয়, বরং তা বাতিল ও মিথ্যা কথা। কারণ মতদ্বৈধ যদি কৃপা হয় তাহলে মতৈক্য ক্রোধ (গযব) হবে। যে কথা কোন মুসলিম বলতে পারে না।

তদনুরূপ এক গড়া হাদীস, "তোমরা যাদু শিক্ষা কর তবে তার দ্বারা কর্ম (আমল) করো না।"

যেমন, "যদি তোমাদের কেউ কোন পাথরে বিশ্বাস রাখে, তবে তা তাকে উপকৃত করে।" অবশ্য প্রচলিত হাদীস "তোমাদের মসজিদ থেকে তোমাদের শিশু ও পাগলদেরকে দূরে রাখ।" এর প্রসঙ্গে ইবনে হাজার বলেন, 'দুর্বল।' ইবনুল জওযী বলেন, 'শুদ্ধ নয়।' আব্দুল হক বলেন, 'এর কোন ভিত্তি নেই।'

পক্ষান্তরে সহীহ হাদীসে প্রমাণিত যে, নবী ﷺ বলেন, "তোমাদের সন্তানদের বয়স সাত বছর হলে তাদেরকে নামায শিক্ষা দাও এবং দশ বছর হলে তার (নামাযের) উপর তাদেরকে প্রহার কর।" *(সহীহ, বাযযার, সহীহুল জামে')*

আর এই শিক্ষা মসজিদে দেওয়া হয়, যেমন রসূল ﷺ তাঁর সাহাবাবর্গকে মিম্বরের উপর থেকে নামায শিক্ষা দিয়েছেন এবং শিশুরা এমন কি নির্বোধ শিশুরাও তাঁর মসজিদে থাকত।

১। হাদীস (বলার বা লিখার) শেষে এটুকু বলা যথেষ্ট নয় যে, হাদীসটিকে তিরমিযী বা অন্য কেউ বর্ণনা করেছেন। যেহেতু তিনিও কখনো কখনো অশুদ্ধ (যয়ীফ ইত্যাদি) হাদীস বর্ণনা করে থাকেন। সুতরাং হাদীসের মান 'সহীহ', 'হাসান' বা 'যয়ীফ' উল্লেখ করা জরুরী।

অবশ্য আমাদের এই বলা যে, 'হাদীসটিকে বুখারী অথবা মুসলিম বর্ণনা করেছেন' এতটুকুই যথেষ্ট। কারণ উভয়ের বর্ণিত হাদীসগুলি সহীহ।

২। দুর্বল হাদীসের বাচনিক সম্বন্ধ -তার বর্ণনা-সূত্রে অথবা মূল বক্তব্যে কোন ত্রুটি বর্তমান থাকার কারণে- রসূল ﷺ-এর প্রতি প্রতিপাদিত নয়। আমাদের কেউ যদি যবেহর পশু ক্রয় করতে বাজারে গিয়ে একটি মাংসল সুস্থ এবং অপরটি ক্ষীণ দুর্বল দেখে, তবে নিশ্চয়ই সে মোটাতাজা মাংসল পশুটাকেই পছন্দ করে গ্রহণ এবং দুর্বলটিকে বর্জন করে। কুরবানীর জন্য মোটাতাজা মাংসল পশু যবেহ করতে এবং রুগ্ণ ও দুর্বল ত্যাগ করতে ইসলাম

আমাদেরকে আদেশ করে। সুতরাং দ্বীনের ব্যাপারে বিশেষ করে সহীহ হাদীসের বর্তমানে দুর্বল হাদীস গ্রহণ ও ব্যবহার করা কিরূপে বৈধ হতে পারে?

হাদীস-বিশেষজ্ঞগণ স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন যে, হাদীস যয়ীফ বা দুর্বল হলে তা 'রসূল ﷺ বলেছেন' একথা বলা হবে না। যেহেতু এ পরিভাষা সহীহ হাদীসের জন্য ব্যবহৃত। দুর্বল হাদীসের ক্ষেত্রে 'বর্ণনা করা হয়েছে, বর্ণনা করা হয়ে থাকে, কথিত আছে' ইত্যাদি কর্মবাচ্য- মূলক শব্দ ব্যবহার করতে হবে। যাতে উভয়ের (সহীহ ও যয়ীফের) মাঝে পার্থক্য নিরূপিত হয়।

৩। পরবর্তী কোন কোন উলামা কিছু শর্তের সাথে যয়ীফ হাদীস ব্যবহার করা বৈধ মনে করেন, যেমন ঃ-

ক। হাদীস যেন 'ফাযায়েলে আ'মালে' (কোন শুদ্ধভাবে প্রমাণিত আমলের ফযীলত বর্ণনায়) হয়।

খ। তা যেন সুন্নাহর সহীহ ভিত্তির অন্তর্ভুক্ত হয়।

গ। তার দুর্বলতা যেন খুব বেশী না হয়।

ঘ। তা ব্যবহার করার সময় তা শুদ্ধ প্রমাণিত বলে যেন বিশ্বাস না রাখা হয়।

কিন্তু বর্তমানে লোকেরা কদাচিৎ এই সব শর্তের অনুবর্তিতা করে থাকে।

কতিপয় জাল হাদীসের নমুনা

১। "আল্লাহ তাঁর নিজ নূর (জ্যোতির) এক মুষ্ঠি ধারণ করে তার উদ্দেশ্যে বলেন, 'তুমি মুহাম্মাদ হয়ে যাও।" (জাল)

২। "আল্লাহ প্রথম যা সৃষ্টি করেন তা হল তোমার নবীর নূর, হে জাবের!" (গড়া বা জাল)

৩। "তোমরা আমার মর্যাদার অসীলায় (করে দুআ) কর।" (ভিত্তিহীন)

৪। "যে ব্যক্তি হজ্জ করল, অথচ আমার (কবর) যিয়ারত করল না সে আমার প্রতি দুর্ব্যবহার করল।" (হাফেয যাহাবী এটিকে জাল বলেছেন।)

৫। “মসজিদে কথাবার্তা বলা নেকী (পুণ্য) খেয়ে ফেলে যেমন আগুন ইন্ধন খেয়ে (ধ্বংস করে) ফেলে।” (হাফেয ইরাকী বলেন, ‘ভিত্তিহীন।’)

৬। “আমার অবস্থা সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান আমার যাচনা থেকে যথেষ্ট করবে।” (ইবনে তাইমিয়্যাহ বলেন,‘গড়া।’)

৭। “স্বদেশ-প্রেম ঈমানের অংশ বিশেষ।” (জাল, যেমন আসফাহানী বলেন।)

৮। “তোমরা বৃদ্ধাদের দ্বীন অবলম্বন কর।” (জাল, ভিত্তিহীন।)

৯। “যে নিজেকে চিনেছে সে তার প্রভুকে চিনেছে।” (ভিত্তিহীন)

১০। “আমি গুপ্ত ধন-ভান্ডার ছিলাম।” (ভিত্তিহীন)

১১। “আদম যখন ত্রুটি করে বসলেন তখন তিনি বললেন, ‘হে প্রতিপালক! আমি মুহাম্মাদের অসীলায় প্রার্থনা করছি আমাকে ক্ষমা করে দাও----।” (জাল)

১২। “আলেমগণ ব্যতীত সমূহ মানুষ মৃত, এবং আমলকারীগণ ব্যতীত সমস্ত আলেম সর্বনাশগ্রস্ত, এবং মুখলিস (বিশুদ্ধচিত্ত)গণ ব্যতীত সমস্ত আমলকারীগণও জল-নিমজ্জিত। আর মুখলেসগণও বড় বিপদের সম্মুখীন।” (গড়া)

কবর যিয়ারতের পদ্ধতি

মহানবী ﷺ বলেন, “আমি তোমাদেরকে কবর যিয়ারত করতে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু এখন তোমরা যিয়ারত কর। যাতে ঐ যিয়ারত তোমাদেরকে কল্যাণ (পরকাল-চিন্তা) স্মরণ করিয়ে দেয়।” *(সহীহ, মুসনাদে আহমদ)*

১। কবরস্থানে প্রবেশের সময় মৃত ব্যক্তিদের জন্য সালাম ও দুআ করা সুন্নত। রসূল ﷺ তাঁর সাহাবাকে এই সালাম ও দুআ পড়তে শিখিয়েছেন ঃ

.

আস্‌সালা-মু আলইকুম আহলাদ্ দিয়া-রি মিনাল মু'মিনীন, অইন্না ইনশা-আল্লা-হু বিকুম লালা-হিক্বূন, আসআলুল্লা-হা লানা অলাকুমুল আ-ফিয়াহ।

অর্থাৎ, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষণ হোক, হে কবরবাসী মুমিনগণ! আল্লাহ চাইলে আমরা তোমাদের সহিত মিলিত হব। আমি আমাদের এবং তোমাদের জন্য (আযাব হতে) নিরাপত্তা কামনা করি।" *(মুসলিম)*

২। কবরের উপর বসা তার উপর চলা ও দলা বৈধ নয়। কারণ রসূল ﷺ বলেন, "তোমরা কবরের দিকে (মুখ করে) নামায পড়ো না এবং তার উপর বসো না।" *(মুসলিম)*

৩। কবরবাসীর নৈকট্যলাভের উদ্দেশ্যে কবরের তওয়াফ না করা। যেহেতু আল্লাহ তাআলা বলেন, ( )

অর্থাৎ, তারা যেন প্রাচীন গৃহের তওয়াফ করে। (অর্থাৎ কেবল কা'বারই তাওয়াফ বিধেয়।)

৪। কবরস্থানে কুরআন শরীফের কোন অংশ না পড়া। যেহেতু নবী ﷺ বলেন, "তোমরা তোমাদের গৃহকে কবরস্থান বানিও না। যেহেতু শয়তান সেই গৃহ হতে পলায়ন করে; যে গৃহে সূরা বাক্বারাহ পাঠ করা হয়।" *(মুসলিম)*

উক্ত হাদীসে ইঙ্গিত রয়েছে যে, কবরস্থান কুরআন পাঠের স্থান নয়। পক্ষান্তরে গৃহে কুরআন পাঠ করতে হয়। প্রকাশ যে, কবরস্থানে বা কবরের পাশে কুরআন পাঠের ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলি সহীহ নয়।

৫। মৃতব্যক্তির নিকট হতে মদদ ও সাহায্য ভিক্ষা করা শির্কে আকবর; যদিও তিনি নবী অথবা অলী হন। কারণ আল্লাহ তাআলা বলেন,

( )

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর পরিবর্তে তাদেরকে আহবান করো না; যারা তোমার উপকার করতে পারে না এবং অপকারও করতে পারে না। করলে তুমি সীমালংঘনকারী (মুশরিকদের) শ্রেণীভুক্ত হবে। *(সূরা ইউনুস ১০৬ আয়াত)*

৬। কবরের উপর ফুলের তোড়া না রাখা অথবা রাখার জন্য পুষ্প-স্তবক বহন না করা। কারণ তাতে খ্রিষ্টানদের আনুরূপ্য গ্রহণ করা হয় এবং অনর্থক নিষ্ফল বিষয়ে অর্থ নষ্ট হয়। অথচ ঐ অর্থ যদি মৃতের নামে গরীবদেরকে দান করা হয়, তাহলে মৃত ও গরীব সকলেই উপকৃত হয়।

৭। কবরের উপর ইমারত নির্মাণ অথবা তার উপর কুরআনের কোন অংশ অথবা কোন কবিতা-স্তোত্র লিখন বৈধ নয়। কারণ হাদীসে এ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা এসেছে; "তিনি ﷺ কবরকে পাকা-চুনকাম করতে এবং তার উপর ইমারত নির্মাণ করতে নিষেধ করেছেন।"

কবর চেনার জন্য বিঘত পরিমাণ উঁচু পাথর (শিয়রদেশে) রাখাই যথেষ্ট। যেমন রসূল ﷺ উসমান বিন মযউনের কবরের উপর একটি পাথর রেখে বলেছিলেন, "আমার ভায়ের কবরের উপর চিহ্ন রাখছি।" *(হাদীসটিকে আবু দাউদ হাসান সনদ দ্বারা বর্ণনা করেছেন।)*

অন্ধানুকরণ (তকলীদ)

১। আল্লাহ পাক বলেন,

)

(

অর্থাৎ, আর ওদেরকে যখন বলা হয় যে, 'তোমরা আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে এবং রসূলের দিকে এস তখন ওরা বলে, আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যাতে (যে মতাদর্শে) পেয়েছি তাই আমাদের জন্য যথেষ্ট।'

যদিও ওদের পূর্বপুরুষগণ কিছুই জানত না এবং সৎপথপ্রাপ্ত ছিল না, তথাপিও?! *(সূরা মা-য়েদাহ ১০৪ আয়াত)*

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে মুশরিকদের অবস্থা বর্ণনা করে বলেন যে, রসূল ﷺ যখন তাদেরকে বললেন, 'তোমরা কুরআন, আল্লাহর তওহীদ ও একমাত্র তাঁকেই আহবান করার প্রতি এসো', তখন তারা বলল, 'আমাদের বাপ-দাদাদের আকীদা ও বিশ্বাসই আমাদের জন্য যথেষ্ট।' কুরআন ঐ দাদু-পন্থীদের প্রতিবাদ করে বলে, তোমাদের বাপ-দাদারা মূর্খ ছিল, তারা কিছু জানতো না এবং সৎপথের পথিকও ছিল না।

২। বহু মুসলমানই এই অন্ধানুকরণে আপতিত। এক বক্তা আলেমকে তাঁর বক্তৃতায় বলতে শুনেছি, 'আপনাদের পূর্বপুরুষরা কি জানত যে, আল্লাহর হাত আছে?

অর্থাৎ, তিনি তাঁর বাপদাদাদেরকে দলীল করে আল্লাহর হাত অস্বীকার করতে চান। অথচ কুরআন তা সাব্যস্ত করে। আল্লাহ তাআলা আদম সৃষ্টির ব্যাপারে বলেন, ( )

অর্থাৎ, (হে ইবলীস!) আমি যাকে স্বীয় হস্তদ্বয় দ্বারা সৃষ্টি করেছি তাকে সিজদা করতে তোমাকে কে বাধা দিল ? *(সূরা স্বাদ ৭৫ আয়াত)*

কিন্তু তাঁর হাত কোন সৃষ্টির হাতের মত নয়। কারণ তিনি বলেন,

( )

অর্থাৎ, কোন কিছু তাঁর সদৃশ নয় এবং তিনি সর্বশ্রোতা সর্বদ্রষ্টা। *(সূরা শূরা ১১)*

৩। অন্য ক্ষেত্রে আর এক প্রকার ক্ষতিকর তকলীদ (অন্ধানুকরণ) রয়েছে; আর তা হল অশ্লীলতা, নগ্নতা, বেপর্দা ও টাইট-ফিট্ পরিচ্ছদে পাশ্চাত্যের অন্ধানুকরণ করা। অথচ হায়! যদি আমরা ফলপ্রসূ বিজ্ঞান ও আবিষ্কারে যেমন বিমান ইত্যাদি উপকারী আধুনিক যন্ত্রাদি নির্মাণে তাদের অনুকরণ করতাম তাহলে কৃতার্থ হতে পারতাম।

৪। বহু মানুষ আছে তাদেরকে যদি কোন বিষয়ে আপনি বলেন, 'আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর রসূল বলেছেন'- তাহলে তারা উত্তর দেয়, 'আমাদের

হুযুর বা পীর সাহেব বা গুরু এই বলেছেন!!' তারা কি আল্লাহর এই বাণী শ্রবণ করেনি ?-

( )

অর্থাৎ, হে মু'মিনগণ! তোমরা (কোন বিষয়ে) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না। *(সূরা হুজরাত ১ আয়াত)*

অর্থাৎ আল্লাহ ও রসূলের কথার উপর আর কারো কথাকে শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য দিও না। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'আমার মনে হয় ওরা ধ্বংস হয়ে যাবে! আমি বলছি, নবী ﷺ বলেছেন, আর ওরা বলছে, আবু বকর ও উমার বলেছেন!' *(মুসনাদে আহমদ প্রমুখ, আহমদ শাকের এটিকে শুদ্ধ বলেছেন।)*

যারা তাদের হুযুর ও গুরুর কথাকে দলীলরূপে পেশ করে, তাদের প্রতি বিস্ময় প্রকাশ করে ও প্রতিবাদ করে কবি বলেন,

"আমি বলছি, 'আল্লাহ বলেছেন ও তাঁর রসূল বলেছেন,'
আর তুমি উত্তরে বলছ, 'আমার শায়খ বলেছেন ?!'

সত্য প্রত্যাখ্যান করো না

১। আল্লাহ মানুষের জন্য রসূলগণকে প্রেরণ করেছেন এবং তাঁদেরকে আল্লাহর ইবাদত ও তাঁর একত্ববাদের প্রতি দাওয়াত দিতে আহবান করেছেন। কিন্তু অধিকাংশ জাতি রসূলগণকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করল। এবং যে সত্যের প্রতি তাদেরকে আহবান করা হয়েছিল তা তারা প্রত্যাখ্যান করল। আর সে সত্য ছিল তওহীদ। তাই তাদের পরিণাম ছিল ধ্বংস।

২। প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তির অন্তরে অণু পরিমাণ ঔদ্ধত্য থাকবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।" অতঃপর তিনি বলেন, "ঔদ্ধত্য হল, সত্য প্রত্যাখ্যান করা এবং মানুষকে ঘৃণা করা।" *(মুসলিম)*

অতএব অত্র হাদীসের আলোকে কোন মু'মিনের জন্য সত্য এবং উপদেশ প্রত্যাখ্যান করা বৈধ নয়। যাতে সে কাফেরদের অনুরূপ না হয়ে যায় এবং সেই অহংকার ও ঔদ্ধত্যে না পড়ে যায়, যা অহংকারী ও উদ্ধত মানুষকে জান্নাত প্রবেশে বাধা দেয়। কেন না হিকমত ও জ্ঞান মুমিনের হারানো বস্তু, যেখানেই সে তা পায় কুড়িয়ে নেয়।

৩। সত্য ও ন্যায় স্বীকার ও গ্রহণ করা ওয়াজেব তাতে তা যে মানুষ থেকেই হোক না কেন, এমন কি শয়তানের নিকট থেকেও সত্য গ্রহণ করা যায়। হাদীসে বর্ণিত যে, একদা রসূল ﷺ আবু হুরাইরাকে বায়তুল মালের উপর পাহাড়াদার নিযুক্ত করলেন; এক চোর চুরি করতে এলে আবু হুরাইরা তাকে ধরে ফেললেন। চোরটি তাঁর নিকট ক্ষমার আশা ব্যক্ত এবং নিজ দরিদ্রতার কথা প্রকাশ করলে তিনি তাকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু চোরটি দ্বিতীয়বার ও তৃতীয়বার চুরি করতে এল। প্রত্যেকবার আবু হুরাইরা তাকে ধরে বললেন, 'তোমাকে রসূলের দরবারে পেশ করবই।' চোরটি বলল, 'আমাকে ছেড়ে দাও, আমি তোমাকে কুরআনের এমন একটি আয়াত শিখিয়ে দেব, যা পাঠ করলে শয়তান তোমার নিকটবর্তী হবে না।' আবু হুরাইরা বললেন, 'তা কোন আয়াত?' চোরটি বলল, 'আয়াতুল কুরসী।' আবু হুরাইরা তাকে ছেড়ে দিলেন। অতঃপর তাঁর দেখা এই ঘটনা রসূল ﷺ-এর নিকট বর্ণনা করলে তিনি বললেন, "তুমি জান কি, কে এ কথা বলেছে? ও ছিল শয়তান। সে বলেছে সত্যই অথচ নিজে ভীষণ মিথ্যুক।" *(বুখারী)*

মুসলিমের আকীদাহ্

আহমদ ﷺ -এর অনুসারী যদি হয় ওয়াহাবী
তাহলে আমি স্বীকার করি যে, আমি ওয়াহাবী।

আল্লাহ থেকে শরীক খন্ডন করি, সুতরাং নেই আমার
একমাত্র 'আল-ওয়াহ্হাব' (মহাদাতা আল্লাহ) ব্যতীত কোন প্রভু।
না কোন গম্বুজ (মাযারের) নিকট আশা আর না কোন মূর্তি
ও কবর (বিপদমুক্তি ও সুখ অর্জনের) হেতু।
কক্ষনই না, না পাথর, না কোন বৃক্ষ, না নির্ঝর,
আর না কোন প্রতিষ্ঠিত বেদী (আস্তানা আমার বিপত্তারণ)।
আমি তা'বীয (কবচ)ও বাঁধিনা। বালা, কড়ি (জীবশাঁক),
কিছুর দাঁত (বা হাড়)ও উপকারের আশায় অথবা বিপদ
অপসারণের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করি না।
আল্লাহই আমাকে উপকৃত করেন এবং আমার বিপদ দূর করেন।
বিদআত এবং দ্বীনে রচিত অভিনব প্রত্যেক কর্মকে
জ্ঞানীগণ অস্বীকার ও খন্ডন করেন।
আমি আশা রাখি যে, আমি তার নিকটবর্তী হব না
এবং তাকে দ্বীন বলে সমর্থন করবো না, কারণ তা তো সঠিক নয়।
আমি আশ্রয় চাই জাহমিয়াত ([17]) থেকে যা হতে
প্রত্যেক সন্দেহ পোষণকারী অপব্যাখ্যাতার মতভেদ সীমালংঘন করেছে।
আল্লাহর আরশে সমারূঢ় থাকা এক কুদরত। এ ব্যাপারে আমার জন্য
মহা মতি ইমামগণের কথাই যথেষ্ট ;
শাফেয়ী, মালেক, আবু হানীফাহ এবং মুত্তাকী আল্লাহ-মুখী ইবনে হাম্বল।
কিন্তু বর্তমানে যে রাখে এই আকীদাহ ও বিশ্বাস
লোকেরা শোর করে তার প্রসঙ্গে বলে, 'আকারবাদী ওয়াহাবী!'
হাদীসে বর্ণিত যে, ইসলামের অনুসারী মানুষ (প্রবাসীর মত) মুষ্টিমেয়
তাই প্রিয়ের উচিত, মুষ্টিমেয় প্রীতিভাজনদের জন্য রোদন করা!
আল্লাহ আমাদেরকে রক্ষা করুন ও আমাদের দ্বীন সংরক্ষণ করুন
গালি-মন্দকারী প্রত্যেক হঠকারীর মন্দ হতে।
আর তিনি একনিষ্ঠ দ্বীনের সাহায্য করুন

---

(১৭) আল্লাহর গুণাবলী অস্বীকারকারী ও তার অপব্যাখ্যাকারী এক মযহাব।

কিতাব ও সুন্নাহর অনুসারী জামাআত দ্বারা।
যাঁরা কারো রায় ও কিয়াসের অনুকরণ করেন না
যাঁদের জন্য দুই অহীই আশ্রয়স্থল।
মনোনীত (নবী) যাঁদের প্রসঙ্গে সংবাদ দিয়ে বলেছেন,
তাঁরা পরিজন ও সঙ্গীদের মধ্যে অনন্যসাধারণ।
তাঁরা সৎপথের পথিক (সাহাবা)দের পথ ধরে চলেন
আর সঠিকতা নিয়ে তাঁদের মতাদর্শের অনুগমন করেন।
এ জন্যই অতিরঞ্জনকারীরা তাঁদের নিকট হতে দূরে
সরে যায়। আমরা বলি, 'তা তো আশ্চর্যের কিছু নয়।
তারাও দূরে সরে গেছে, যাদেরকে সৃষ্টির সেরা আহবান করেছিলেন।
তখন তারা তাঁকে যাদুকর ও মিথ্যুক বলে অভিহিত করেছিল।
অথচ তারা তাঁর আমানতদারী, ধর্ম, সম্মান ও কথার
সত্যবাদিতায় বিশ্বাসী ছিল।'
আল্লাহ তাঁর উপর চিরস্থায়ী করুণা বর্ষণ করুন
আর তাঁর বংশধর এবং সাহাবাবর্গের উপরেও। (আমীন)
-শায়খ মুল্লা উমরান

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.

*** সমাপ্তি ***